Paper-II

একক ১ ❑ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা
১.১ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন
১.২ অষ্টাদশ শতকে ভারতের বুকে স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন আঞ্চলিক শক্তি(র উত্থান
১.৩ মহীশূরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা
১.৪ মহীশূরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন
১.৫ শিখদের উত্থান ঃ রঞ্জিত সিংহ
১.৬ গ্রন্থপঞ্জি
১.৭ অনুশীলনী

১.০ প্রস্তাবনা

বাঙালী কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' কবিতায় এই মর্মে খেদোক্তি(প্রকাশ করেছিলেন যে এই যুদ্ধের পরিণতিতে 'ভারতের বুকে দুর্দিনের অমাবস্যার সূত্রপাত হয়েছিল।' তিনি এই যুদ্ধকে স্বাধীন ভারতের শেষ এবং বিদেশী আধিপত্যের সূচনা রূপে দেখেছিলেন। শুধু কবি নবীনচন্দ্র সেনই নন, পরবর্তীকালে অনেক পেশাদার ঐতিহাসিকও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের শোচনীয় পরাজয়কে ঘিরে আবেগ অনুভূতি রোমান্টিকভাবে ব্যক্ত(করেছিলেন। আর এই রোমান্টিকতাবাদের মাধ্যমেই বাংলায় উপজাতীয়তাবাদের এক প্রচ্ছন্ন আবির্ভাব ঘটেছিল। পলাশীর যুদ্ধকে সামরিক প্রে(তে আমরা কোনো বড় মাপের যুদ্ধ বলে চিহ্নি(ত করতে পারি না। তবে তাই বলে এই যুদ্ধের গু(ত্বকে অস্বীকার করা যায় না। সাম্প্রতিককালেও আমরা সেই প্রবণতাও পরিলি(ত হতে দেখি। একথা বলা হয়ে থাকে যে পলাশীর যুদ্ধের দ্বারা ভারতে কিন্তু ব্রিটিশ বিজয়ের পালা সাঙ্গ হয় নি। যদি ব্রিটিশরা সমসাময়িক অন্য কোনো যুদ্ধে পরাজিত হত তাহলে বাংলার ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের সেভাবে কোনো গু(ত্ব থাকত না। এমনকী একথাও বলা হয়ে থাকে যে বক্সারের তুলনায় পলাশীর যুদ্ধের গু(ত্ব কম ছিল। বক্সারের যুদ্ধে ব্রিটিশরা তাদের উন্নততর সামরিক শক্তি(প্রদর্শন ও আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছিল। গোড়ার দিকে ঐতিহাসিকরা অষ্টাদশ শতককে ভারতীয় ইতিহাসের এক অবনমনকাল রূপে চিহ্নি(ত করেছেন। Bolts (Considerations of Indian Affairs, 1772) কিম্বা Holwell (Historical Events 1766) এর ন্যায় তৎকালীন ইংরেজ লেখকরা এই যুগকে এক সার্বিক বিশৃঙ্খলার যুগ বলে অভিহিত করেছেন, যা থেকে ভারতীয়রা নিষ্কৃতি পায় ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে। এই ব্যাপারে উত্তরোত্তর ইতিহাস চর্চা যেভাবে এগোয় তার ফলে উপরোক্ত(মতকে খুবই সরলীকরণের দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকরা এখানেও আলোকপাত করেছেন যে বাস্তবতার নিরীখে সেই যুগকে আমরা খুব সহজে ব্যাখ্যা করতে পারি না, এবং সেই যুগের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রসরণের ধারা ছিল পূর্ববর্তীকাল অপে(া জটিল। নব্যগবেষণার আলোকে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে ওঠে যে সং(প্ত পরিসরে হলেও কিছু বিচ্ছিন্ন প্রে(াপটে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের বীজ বপন করা হয়েছিল। অনেকে একথাও ভাবেন যে এই যুগ ছিল ভারতীয় ইতিহাসের মরূদ্যান স্বরূপ। এই ধরনের প্রে(তকে আমরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমর্থন করতে পারি, যেখানে পলাশী বা বক্সারের যুদ্ধ কোনো সীমারেখা নির্দেশ করতে স(ম হয় না। কেম্ব্রিজ বি(বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকরা মনে

করেন যে অষ্টাদশ শতকের ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধারাবাহিকতা এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও প্রাদেশিক রাজ্য বা রিয়াসতের উত্থান এবং তাদের ত্র(মান্বয়িক সামরিক কার্যকলাপ সেভাবে অর্থনীতি ও সমাজের উপর প্রভাব ফেলতে পারে নি, যার কথা একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা বলে থাকতেন। মুঘল সাম্রাজ্য যখন ধীরে ধীরে পতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে সেই সময় অষ্টাদশ শতকে একাধিক স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন আঞ্চলিক শক্তি(র উত্থান হয়। যেমন— বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ ও মহীশুর। মারাঠা, শিখ ও জাঠরা মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর স্বশাসিত রাজ্য গড়ে তোলার প্রয়াস নেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একথা ভাবলে ভুল হবে যে 'রিয়াসৎ' শব্দটিকে রাজ্য বা State হিসাবে দেখা ঠিক নয়, যেখান ভারতে নবাবী 'রিয়াসৎ'গুলি তত্ত্ব বা কার্যগত দিক থেকে কোনোদিনই সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল না। রিয়াসতের প্রধানরা নিজেদের নবাব রূপে অভিহিত করতেন (Satish Chandra—'The 18th Century in India, 1986)। এই রিয়াসৎগুলি গড়ে তুলেছিল মুঘল সুবাদার বা উচ্চাকাঙ্ী অভিজাতরা যারা মোটামুটি স্বাধীনভাবেই তাদের (মতা বিস্তার করেছিল, সাধারণত এই প্রতিটি রাজ্যের অভিষেক সম্রাট কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে থাকত, যে(ত্রে সম্রাটকে কিছু নজরানা দেওয়া হত ও এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক প্রভাবও সত্রি(য় ছিল। বিভিন্ন গু(ত্বপূর্ণ দুর্গের কিলাদার বা দুর্গাধিপতি, কাজী প্রভৃতির নিযুক্তি(র জন্য সম্রাটের অনুমোদন লাগত। আধুনিক কালের ইতিহাস চর্চা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রাদেশিক রাজ্যগুলির উত্থান ছিল গু(ত্বপুর্ণ। অষ্টাদশ শতকের আধুনিক পন্ডিতরা এই অভিযোগ দূরীকরণের চেষ্টা করেছেন যে আলোচ্য যুগ ছিল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার যুগ যা থেকে ভারতকে র(া করেছিল ব্রিটিশরা। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এক বিশাল প্রতিত্রি(য়ার ঝড় তুলেছিল যা সং(-ষ্ট কালকে আকার ও চরিত্র দান করেছিল।

১.১ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

মুঘল সাম্রাজ্যের খ্যাতি সমগ্র বি(প্যাপী। ১৭০৭ খ্রীঃ যখন ঔরঙ্গজেব মারা যান তখন সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রস্বরূপ এই সাম্রাজ্য ছিল বিরাজমান। এর শাসকরা বি(স্ত ও সামরিক বাহিনী ছিল অপরাজেয় ও তার বিস্তৃতি ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর এক শতকের মধ্যে উত্তরাধিকারী মুঘলরা (মতাচ্যুত হয় এবং বিদেশী শক্তি(সেই সাম্রাজ্যকে গ্রাস করে বিদ্যমান শাসকদের ত্রীড়নকে পরিণত করে।

১৭৪০ খ্রীঃ এরপর মুঘল সাম্রাজ্য দিল্লীর সুবাদে সীমিত হয়, যার অন্তর্ভুক্ত(ছিল আগ্রার কিছু অংশ থেকে চম্বল নদী পর্যন্ত। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইংরাজ ব্যবসায়ীরা ভারতে এমন এক সাম্রাজ্যের অধিকর্তায় পরিণত হয় যার ব্যাপ্তি ছিল মুঘলদের মতন। তবে সকল ঐতিহাসিকরা এই পরিবর্তন ও সাংঘাতিক বিপর্যয় সম্বন্ধে একমত নন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সবচেয়ে বড় কারণ কী তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে আজও বিতর্ক চলছে। এই বিতর্ক সম্বন্ধেজানার প্রয়োজন আমাদের নেই। তবে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ঠিক কী কী কারণ দায়ী ছিল সে সম্পর্কে অবিশ্যক রূপে জ্ঞান লাভের প্রয়োজন আছে।

১.২ অষ্টাদশ শতকে ভারতের বুকে স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন আঞ্চলিক শক্তি(র উত্থান ঃ

মুঘল সাম্রাজ্য যখন ধীরে ধীরে পতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন একাধিক স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন আঞ্চলিক শক্তি(র আবির্ভাব ঘটে— বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর। মারাঠা, শিখ ও জাঠরাও এই সময় নিজেদের স্বাধীন রাজ্য

স্থাপনের প্রয়াস নেয়। মুঘল অভিজাতদের মধ্যে যে ধরনের রাজনীতি বিদ্যমান ছিল তার প্রকৃতিও আমাদের অজানা নয়। সেদিক থেকে বলা যায় এভাবে উদ্ভূত রাজ্যগুলির কিছু ছিল অভিজাতদের দলাদলি ও স্বার্থপরতার ফসল ও অন্যান্যরা ছিল মুঘলদের বি(দ্ধে বিদ্রোহের পরিণামস্বরূপ।

আমরা আগেই দেখেছি যে মুঘল সুবাদার বা উচ্চাভিলাষী অভিজাতদের একাধিক রিয়াসৎ বা রাজ্য গড়ে তুলেছিল যেখানে তারা প্রায় স্বাধীন শাসকের মতই (মতা ভোগ করত। এই সকল রাজ্যের অভিষেক সম্রাটের সম্মতি প্রসূত ছিল, যে(ত্রে তাকে নজরানা দিতে হত বা নেপথ্যে কোনো রাজনৈতিক খেলাও কাজ করত। কিলাদার, কাজী প্রভৃতি পদাধিকারী নিয়োগের (ে ত্রেও সম্রাটের ভূমিকা ছিল। সাম্প্রতিককালের ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সকল প্রাদেশিক রাজ্যগুলির উত্থান তাৎপর্যপূর্ণ। আর এরূপ প্রে(তেই ঐতিহাসিকরা এহেন অভিযোগ খন্ডন করতে বদ্ধপরিকর যে, এই যুগ বিশৃঙ্খলার যুগ ছিল যেখানে র(াকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় ব্রিটিশরা।

এই সকল উদীয়মান রাজ্যগুলির অবস্থান থেকে মনে হয় যে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে যে সাময়িক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক ছিল না ও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপনের চেষ্টা কষ্টকর। এই রাজ্যগুলি যুগপ্রসৃত অর্থ ও বাণিজ্যিক সমস্যা থেকে মুক্ত(ছিল। প্রাদেশিক শাসকরা কিছুটা সাফল্য সহকারে শক্তি(শালী প্রশাসন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যেখানে বিদ্যমান আইনশৃঙ্খলা আর্থিক বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। বস্তুত বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদের ন্যায় উন্নত রাজ্যগুলিতে শাসনব্যবস্থার পরিসরে আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ প্রতিফলিত হয়েছিল যা স্থানীয় ভূস্বামী, সাধারণ কর্মচারী ও বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রধানদের আনুগত্য অর্জনে স(ম হয়েছিল। এই সকল রাজ্যগুলি স্থানীয় সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্ররূপেও পরিগণিত হয়েছিল, যেখানে তারা শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে থাকত। এই রাজ্যের শাসকরা সাধারণত যে নীতি গ্রহণ করতেন তা চরিত্রের দিক থেকে ধর্মীনিরপে(ছিল এবং ধর্ম সেখানে একান্ত ব্যক্তি(গত বিষয়ের মর্যাদা পেয়েছিল। সরকারী চাকুরীর (ে ত্রে রাজারা ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করতেন না এবং সবই ছিল আধুনিকতার চিহ্(— যা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে অষ্টাদশ শতক সম্পূর্ণ অব(য় ও অবনমনের কাল ছিল না, যেখানে সংস্কার ও পুনর্জাগরণের চেতনা প্রতিফলিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এই প্রাদেশিক রাজ্যগুলিতে কী ধরণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়— এখানে উচ্চমানের পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হত, যে(ত্রে কারগিরদের একটা বড় ভূমিকা ছিল, তখন মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ হয় এবং গ্রামের পণ্য উৎপাদকদের সঙ্গে শহরের সং(-ষ্ট অঞ্চলের এবং বহুলাংশে উপমহাদেশের আঞ্চলিক বাজারের একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, প্রাক্-ঔপনিবেশিক রাজ্য বিভিন্ন আধুনিক প্রকরণের মাধ্যমে উৎপাদন ও ব্যবসার গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক গবেষণা আলোচ্য বিষয়ের উপর নতুন আলোকপাত করে থাকে। C.A Bayly, David Washbrook, Frank Pertin এর ন্যায় দ(ঐতিহাসিকরা যারা অষ্টাদশ শতকের ভারত নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তারা এই মর্মে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের চ্যালেঞ্জ জানান যে একদা এই জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা লিখেছিলেন যে প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগে একটি জাতীয়তাবাদী অর্থনীতি বিদ্যমান ছিল ও ব্রিটিশ শাসন এই প্রাক্-ঔপনিবেশিক জাতীয় অর্থনীতিকে একটি আধুনিক শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির পথে অগ্রসর হতে দেয়নি।

যাইহোক একথা বোঝা যায় যে যদি বাংলা, মহীশূর, অযোধ্যার ন্যায় রাজ্যগুলি টিকে থাকতে সমর্থ হয় তবে ভারতের অন্যান্য রাজ্য সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে বিদ্যমান থাকতে পারত, সেদিক থেকে অষ্টাদশ শতক ছিল অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক সংঘবদ্ধ ধারাবাহিকতার নামান্তর যে ধারাবাহিকতার ধারা সপ্তদশ শতকেই দৃষ্ট হয়েছিল, আর ঔপনিবেশিক অর্থনীতির জন্য প্রস্তুতি অনেক পরের ঘটনা ছিল।

১.৩ মহীশূরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবয়ব

অষ্টাদশ শতকে কিছু দেশীয় নবাবী রিয়াসৎগুলিতে যে ধরণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল তাদের কিন্তু গোড়ার দিকের ঐতিহাসিকদের মত আমরা অন্তঃসারশূন্য হিসাবে দেখব না। সাম্প্রতিক গবেষণার পরিণতিতে আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে এই যুগ অব(য় ও বিনাশের কারণ ছিল না। তারা মনে করেন যে যদি হায়দার ও টিপুর অধীনে মহীশূর তার প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখতে স(ম হয়, তবে সেই পদ্ধতি অন্যত্র অনুসরণ করা যেত। যদিও শেষ পর্যন্ত মহীশূর ব্রিটিশের করতলগত হয়, তবু ও তার একক বিদ্যমানতাও আমরা অপসৃত হতে পারি না। হায়দার ও টিপুর অধীনে মহীশূরে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল স্বৈরতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ। বলা যায় সামন্তপ্রভু থেকে শু(করে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত যে ধরণের আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামো উপস্থিত ছিল তার সহযোগিতাতে কেন্দ্রে (মতার বিন্যাস অত্যন্ত সুদৃঢ় ভাবে হয়েছিল। স্বৈরাচারী হওয়া সত্ত্বেও হায়দার ও টিপু জনকল্যাণকামী ছিলেন, আর সেদিক থেকে তাদের সঙ্গে আমরা অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীদের তুলনা করতে পারি।

মহীশূর রাজ্য বেশ কিছু জনকল্যাণকামী কার্যকলাপে রত হয়েছিল, যথা— খাল খনন, জলসম্পদের সুব্যহার, রাস্তা নির্মাণ, সেচব্যবস্থার উন্নয়ন। বিশেষতঃ টিপু সুলতান মদ্যপান ও মহিলাদের উপর নির্যাতন রোধের প্রসঙ্গে সচেতনতার পরিচয় দিয়ে সমাজ সংস্কারের পথ মসৃণ করেছিলেন। টিপুর মনীষা ছিল সুবিস্তৃত এবং তিনি শাসন কাঠামোর উপর নানা ধরণের পরী(া নিরী(া চালিয়েছিলেন। তবে ইংরেজদের শত্রুতার দ(ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পুনর্নির্মাণের প্রয়াস টিপুর সফল হয়নি এবং তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যগুলিও ব্যর্থ হয়ে যায়।

সামরিক বাহিনীকে নতুন করে সাজানোর ব্যাপারে হায়দার ও টিপুর বিশেষ ভূমিকা ছিল। বস্তুত মহীশূরের শাসকরা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন ও তা পূরণের জন্য অপরিহার্য রূপে একটি উৎকৃষ্টতর সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তাও জানতেন। হায়দার আলী তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে সেরা অশ্বারোহী বাহিনীতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন এবং হায়দার ও টিপু উভয়েই ইউরোপীয়দের ন্যায় তাদের গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীকে আধুনিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে তারা ফরাসীদের সাহায্য নিতেও কসুর করেননি।

হায়দার ও টিপুর আমলেও যে আর্থিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল তা স্বাভাবিকভাবেই অলোচনার দাবী রাখে। শাসকরা শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নয়ন চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে যাবতীয় পরিকল্পনা ছিল হায়দার আলীর মস্তিষ্ক প্রসূত, যে ঐতিহ্য বহন করেছিলেন তাঁর পুত্র। জলসেচ ব্যবস্থার পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা তারা উৎপাদকদের দান করেছিলেন। এর পাশাপাশি সরকার গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থের যোগানও দিয়েছিল। দুর্দিনে কৃষকদের ঋণ দেওয়া হত টিপুর পৃষ্ঠপোষণায় বিভিন্ন স্থানে নানা দ্রব্য উৎপাদনকারী 'Unit' বা একক গড়ে উঠেছিল। বিদেশের প্রযুক্তি(স্বরাজ্যে প্রয়োগ প্রসঙ্গে টিপুর কোনো দ্বিধা ছিল না। প্রকৃতপ(মহীশূরের শিল্প অর্থনীতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানোর জন্য ফ্রান্স ও তুরস্কের সহযোগিতা টিপুর একান্ত কাম্য ছিল এবং এ ব্যাপারে তাঁর কোনো সংশয় ছিল না। মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ, স্থানীয় ও উপমহাদেশের বাজারের মধ্যে সংহতি ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন ছিল মহীশূর অর্থনীতির সদ্যোত্থিত বৈশিষ্ট। সাম্প্রতিক অর্থনীতিক ঐতিহাসিকরা এরূপ মত প্রকাশ করে থাকেন যে টিপুর মহীশূর বৃহত্তর শিল্পায়নের পথে এগিয়ে ছিল। টিপু নানা পরিস্থিতির সুযোগে মহীশূরের অর্থনীতিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তবে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কৃষি থেকে আয়ের পরিমাণ হ্রাস এবং বর্ধিত সামাজিক ব্যয়— এই দুয়ের মধ্যে সংহতি স্থাপনের সমস্যা অন্যান্য রাজ্যগুলির মত মহীশূরকেও ভুগিয়েছিল।

১.৪ মহীশূরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন

ছত্রপতি কিম্বা রাজা ছিলেন এমন এক আধার যাকে কেন্দ্র করে শিবাজীর সময় যাবতীয় (মতার প্রয়োগ হত। কিন্তু একথা উল্লেখ করার প্রয়োজন যে মারাঠাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি গুণগত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। শিবাজীর উত্তরাধিকারীদের অধীনে ছাত্রপতি বা রাজার হাতে কোনো (মতাই ছিল না। বলা যায় যে এই সময় যে সামন্ততান্ত্রিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল সেই প্রত্রি(য়ার হাত ধরে মারাঠাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক (মতা বিকেন্দ্রীভূত হয়। এই প্রত্রি(য়ার সূত্রপাত আমরা দেখি বালাজী বি(নাথের সময়, যিনি মারাঠা সর্দারদের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চল 'ওয়াতন' কিম্বা (জাগীর) হিসাবে দান করেছিলেন। এই রাজনৈতিক পদ্ধতিকে ব্যবহার করে পেশোয়া মারাঠা সর্দারদের আনুগত্য আদায় করতে চেয়েছিলেন। তবে ভবিষ্যতে এই প্রথা মারাঠা সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কারণ রূপে চিহ্নি(ত হয়। এই ব্যবস্থায় পেশোয়া মারাঠা সাম্রাজ্যে প্রকৃত শাসকে পরিণত হন এবং ছত্রপতি কিম্বা শিবাজীর উত্তরপু(ষেরা প্রতীকী প্রধানরূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে স(ম হয়।

অর্থনৈতিক সামন্ততন্ত্রীকরণের এই প্রত্রি(য়া রাজনৈতিক সামন্ততান্ত্রিকতার বিকাশ নিশ্চিত করে। যে সকল মরাঠা প্রধানদের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তারা সং(-ষ্ট অঞ্চলগুলিতে প্রশাসনিক প্রধানরূপে জাঁকিয়ে বসে। তারা সর্ব(ে ত্রে এই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। ফলে রাষ্ট্রের মধ্যেই গড়ে ওঠে আর একটি রাষ্ট্র যার স্থপতি হলেন এই মারাঠা সর্দাররা। ফলে রাজনৈতিক (মতা কোনো একক ব্যক্তি(র হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে না। বরং তা ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় মারাঠাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের বন্ধন খুব শিথিল হয়ে পড়ে। এবং তার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে। ফলে মারাঠা সাম্রজ্য এমন এক মিত্রসঙ্ঘে পরিণত হয় যেখানে স্বাধীন মারাঠা প্রধানদের কৃতিত্বই ছিল সবচেয়ে বেশী।

পেশোয়া পুণাতে থাকতেন এবং তার রাজনৈতিক প্রভাব তৎসংলগ্ন অঞ্চলেই সীমিত ছিল। যদিও পেশোয়া পদ ছিল বংশানুত্র(মিক, তাহলেও তিনি তাঁর অনুগত সামন্তপ্রভুদের উপর উত্তরোত্তর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিলেন। যে সকল মারাঠা প্রধান ওয়াতনের অধিকারী ছিলেন তারা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের পরিবর্তে অস্ত্র ধরেন এবং এভাবে তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করে নেন। পেশোয়ার কোনো নিজস্ব সামরিক বাহিনী ছিল না এবং তিনি যুদ্ধের সময় সর্দারদের সাহায্যপ্রার্থী ছিলেন যাদের নিজস্ব সামরিক বাহিনী থাকত। সর্দারদের পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ সামরিক শক্তি(হিসাবে মারাঠাদের গৌরব অনেকটাই স্তিমিত করে দেয়, আর পেশোয়ার প্রতি তাদের আনুগত্য নামমাত্রে পরিণত হয়। এমনকী তারা পুণাস্থিত নানা বিরোধী শক্তি(র সঙ্গে মিলিত হয় এবং মারাঠাদের যারা শত্রু ছিল তাদের সঙ্গে ও সুসম্পর্ক স্থাপন করে। পেশোয়া সর্দারদের উপর কোনো কারণে চাপ সৃষ্টি করলেই তারা মারাঠা সংগঠন ত্যাগ করে অন্য শক্তি(র দলে যোগ দিয়ে থাকত। যদি পেশোয়া অপরাপর মারাঠা শক্তি(, যেমন— নাগপুরের ভোঁসলে, বরোদার গাইকোয়াড়, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া এবং ইন্দোরের হোলকারের মত যদি সুদৃঢ়ভাবে নিজের আধিপত্য কায়েম করতে পারতেন তবে হয়ত ইংরেজদের প্রতি তাঁর বিরোধ অনেক জোরদার হত। যেহেতু মারাঠাদের বিভিন্ন শাখা আলাদা আলাদা ভাবে ব্রিটিশদের বি(দ্ধে লড়েছিল তারা সেভাবে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। আর এরূপ পরিস্থিতিতেই ব্রিটিশরা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাদের বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডরূপে ভারতের বুকে স্থাপন করে।

১.৫ শিখদের উত্থান— রঞ্জিত সিংহ

শিখ ধর্মের প্রবক্ত(া ছিলেন গু(নানক এবং এই ধর্মের বিকাশ হয় পঞ্চদশ শতকে। জাঠ এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য নিম্নবর্গের ব্যক্তি(রা এই ধর্ম গ্রহণ করে ও শিখরূপে পরিচিত হয়। শিখদের দেশপ্রেম ছিল সর্বজনবিদিত এবং ঔরঙ্গজেবের আমলে যে লড়াকু মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তা ছিল প্রশংসনীয়। নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ আবদালীর উষালগ্নে পাঞ্জাবের বুকে যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল শিখেরা তার সুযোগ নেয় এবং তাদের সামরিক শক্তি(র সুদৃঢ়ীকরণ ঘটায়। ১৭৬৫-১৮০০ খ্রীঃ এর মধ্যবর্তী সময় পাঞ্জাবের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে এবং সেখানকার শাসকগোষ্ঠীরূপে স্বীকৃত হয়। তারা ১২টি মিশলে বা গণতান্ত্রিক সংগঠনে পাঞ্জাবকে ভাগ করে এবং রাজনৈতিক (মতার অধিগ্রহণের কালে শিখদের মধ্যে যে 'খালসা' বা ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা ছিল তার বিনাশ ঘটে এবং তার স্থানে পারস্পরিক শত্রুতা প্রকট হয়ে ওঠে।

সুকারচাকিয়া মিশনের রঞ্জিত সিংহ তাঁর নেতৃত্বগুণে, কায়িকশক্তি(বলে এবং চারিত্রিক কাঠিন্যে শিখ মিশলগুলিকে এক শক্তি(শালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। রঞ্জিত সিংহের জন্ম হয় 1780 খ্রীঃ মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি সুকারচাকিয়া মিশলের অধিপতি হন। 1799 খ্রীঃ লাহোর ও 1802 খ্রীঃ অমৃতসর জয়ের মাধ্যমে তিনি আলোচনার পাদপ্রদীপে আসেন। এর কিছুকাল পরে শতদ্রু নদীর পশ্চিমে অবস্থিত ভূখন্ডের শিখ সর্দারদের রঞ্জিত সিং বাধ্য করেন তাঁকে পাঞ্জাবের অধিপতি বলে মেনে নিতে। তিনি পরিচত হন পাঞ্জাব কেশরী রূপে। কাশ্মীর, পেশোয়া ও মুলতান জয়ের মাধ্যমে তিনি তাঁর রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। সামরিক নেতা হিসাবে রঞ্জিত সিংহের পারদর্শিতা ছিল তুলনাতীত। তিনি জানতেন যে (মতালাভের একমাত্র চাবিকাঠি হল সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি আধুনিক ভাবে একটি সশস্ত্র ও শৃঙ্খলাপরয়াণ সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং তাঁর সৈন্যদের প্রশি(ণ দেবার জন্য ইউরোপীয় সেনাদের মোতায়েন করেছিলেন। কামান নির্মাণের জন্য তিনি আধুনিক উৎপাদনশালা ও গড়ে তোলেন। রঞ্জিত সিংহ তাঁর সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনে হিন্দু-মুসলিম উভয়কেই স্থান দিয়েছিলেন।

শতদ্রুর পশ্চিম তীরে সাফল্যমন্ডিত ভাবে শিখদের ঐক্যবদ্ধকরণের পর রঞ্জিত সিং শতদ্রুর সংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি দেন। এবং দুটি অভিযানের মাধ্যমে লুধিয়ানা জয় ও অদম্য প্রয়াসের পর পূর্বদিকে তিনি তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। তবে শতদ্রুর পূর্বতীরের রাজ্যগুলি তাঁর অধীনতা স্বীকার করতে রাজী ছিল না। এবং তারা সাহায্যের জন্য ইংরেজ East India Co. র নিকট আবেদন জানান। ইংরেজরা রঞ্জিতের সম্প্রসারণবাদী নীতি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল এবং এর ফলে তারা পাঞ্জাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের সূবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল। তারা খুব শীঘ্রই পূর্বতীরের রাজ্যগুলির আবেদনে সাড়া দিয়েছিল এবং এভাবে পাঞ্জাবে তাদের অনধিকার প্রবেশের রাস্তা খুঁজে নিয়েছিল। যেহেতু এই সময় আফগানিস্তানের মাধ্যমে ভারতে নেপোলিয়নের আত্র(মণ সম্ভাবনা ছিল তাই অবস্থানগত দিক থেকে তখন পাঞ্জাব ব্রিটিশদের নিকট যথেষ্ট গু(ত্ব পেয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপ(রঞ্জিত সিং-এর সঙ্গে সমঝোতায় প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো চার্লস মেটকাফকে দৌত্য সাধনের জন্য লাহোরে প্রেরণ করেছিলেন। মেটকাফ ও রঞ্জিত সিংহের কূটনৈতিক দৌত্য পরিণতি পায় অমৃতসর সন্ধির (১৮০৯) মাধ্যমে। এই সন্ধির ফলে রঞ্জিত সিংহ শতদ্রুর পূর্ব তীরবর্তী রাজ্যগুলির প্রতি তাঁর দাবী প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন, যেগুলিকে এখন ব্রিটিশরা নিরাপত্তা দিতে থাকে। এর বিনিময়ে ব্রিটিশরা অবশ্য শতদ্রুর পশ্চিম তীরস্থ ভূখণ্ডের উপর রঞ্জিত সিংয়ের সার্বভৌম (মতাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। রঞ্জিতও ব্রিটিশের সঙ্গে কোনো সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে চাননি, তাই তাদের শর্তগুলি তিনি মেনে নন। অমৃতসর সন্ধি সা(রের জন্য এই মর্মে তাঁর সমালোচনা করা হয় যে এই সন্ধির কালে বিদেশী আত্র(মণের সম্ভাবনা অস্তমিত হয়নি এবং তা তাঁর উত্তরাধিকারীগণের নিকট এক চিরস্থায়ী

সমস্যা রূপে গণ্য হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও বলা যায় তিনি ব্রিটিশদের প্রতি যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা যথেষ্ট বাস্তবধর্মী ছিল এবং তিনি তাঁর এরূপ দূরদর্শিতার জন্য অন্তত কিছুকালের জন্য হলেও তাঁর রাজ্যকে ইংরাজ আগ্রাসনের হাত থেকে র(া করতে স(ম হয়েছিলেন। সুতরাং রঞ্জিত সিংয়ের সমালোচনার পাশাপাশি কৃতিত্বও তাঁর প্রাপ্য।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

A. Embree—Charles Grant and the British Rule in India.

A. M. Khan—The Transition in Bengal.

Sirajul Islam—Banglar Oupanibeshik Sasankathamo.

১.৭ অনুশীলনী

১। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিরকম ছিল? বিশেষ করে উল্লেখ করো হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও পাঞ্জাবের কথা।

২। অষ্টাদশ শতকে ভারতের বুকে স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন আঞ্চলিক শক্তি(র উত্থান সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। মহীশূরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?

৪। শিখদের উত্থানে রঞ্জিত সিংহের ভূমিকা আলোচনা কর।

একক ২ ❑ বাংলায় ব্রিটিশ শক্তি(র সুদৃঢ়ীকরণ

গঠন

২.০ ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও বাংলার নবাবগণ
২.১ সিরাজ-উদ-দৌলা ও ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী
২.২ পলাশীর যুদ্ধের তাৎপর্য
২.৩ বক্সারের যুদ্ধ
২.৪ ব্রিটিশদের দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫)
২.৫ গ্রন্থপঞ্জি
২.৬ অনুশীলনী

২.০ ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও বাংলার নবাবগণ

আমরা অগেই দেখেছি যে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর স্বাধীন ও আধা-স্বাধীন রাজ্য বা রিয়াসৎ গড়ে ওঠে। এই সময় কেন্দ্রে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ছিল চোখে পড়ার মত, যার পরিণতিতে মুঘলদের বাংলা সুবা বা প্রদেশেও একটি নববী রিয়াসতে পরিণত হয়। ফা(খসিয়ার ১৭১৭ খ্রীঃ মুর্শিদকুলী খাঁ-কে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত(করেন, আর এভাবেই বাংলায় সুবাদার নিযুক্ত(করেন, আর এভাবেই বাংলায় আধা-স্বাধীন নবাবী রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। মুর্শিদকুলী সমসাময়িক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে নিজেকে বাংলার স্বাধীন নবাবীর শাসনকর্তারা বংশানুত্র(মে নবাবরূপে পরিচিতি লাভ করে। বাংলা প্রদেশের দেওয়ান হিসাবে ১৭০০ খ্রীঃ থেকে মুর্শিদকুলী সং(-ষ্ট অঞ্চলের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তিনি এখনকার সমাজ ও অর্থনীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন।

একটি কাকতালীয় ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে ১৭১৭ খ্রীঃ ইংরেজ East India Co.-র বণিকেরা যারা কলকাতায় তাদের ঘাঁটি গেড়েছিল তারা সম্রাট ফা(খসিয়রের কাছ থেকে দীর্ঘ প্রতী(ি ত ফর্মান লাভ করে যার ভিত্তিতে তারা বার্ষিক ৩,০০০ টাকার বিনিময়ে বিনাশুল্কে বাংলায় ব্যবসা করার অধিকার পায়। আর এরূপ প্রে(াপটে বাংলার নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের বীজ উপ্ত হয়। ফর্মান লাভের ফলে ইংরেজরা যেন হাতে স্বর্গ পায়, কিন্তু তাদের স্বপ্নভঙ্গ হতে বেশিদিন লাগে না। বস্তুত বাংলার নবাবরা দিল্লির দুর্বল সম্রাটদের অপে(া অনেক বেশি শক্তি(ধর ছিলেন এবং তারা কখনোই মুঘল ফর্মান অনুযায়ী ইংরেজদের সবধরণের সুযোগসুবিধা দিতে চায় নি এবং তাদের প্রতিপত্তি বাণিজ্যের চৌহদ্দির মধ্যে সীমিত করে রাখতে চেয়েছিল।

বিদেশী সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্কে মুর্শিদকুলি খাঁ যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। কারণ তিনি বি(াস করতেন যে এ ধরণের বাণিজ্য বাংলার জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বহন করে আনবে। কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হল তখন, যখন ১৭১৭ খ্রীঃ ফর্মান দ্বারা ইংরেজদের বিশেষ সুযোগসুবিধা দেবার প্রবণতা পরিলি(ি ত হয়। এ(ে ত্রে মুর্শিদকুলী এবং পরবর্তী বাংলার নবাবদের ব্রিটিশ বিরোধিতার একটি অন্যতম কারণ হল ফর্মানের অপপ্রয়োগ করে ব্রিটিশ বণিকেরা যে ধরনের ফায়দা লুটেছিল তা কাঙ্খিত ছিল না। প্রকৃতপ(ে ফর্মানের অপপ্রয়োগ করে দস্তকের নামে কোম্পানীর কর্মচারীরা যে শুল্কমুক্ত(ব্যক্তি(গত ব্যবসা চালাচ্ছিল তা নবাবদের শঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। মুর্শিদকুলী খাঁ স্পষ্টতই উল্লেখ করেন যে দস্তকের নামে এরূপ শুল্কমুক্ত(ব্যক্তি(গত ব্যবসার দ(ণ বাংলার কোষাগার তার প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবে। এমতাবস্থায় তিনি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মত ইংরেজদের কিছু শুল্ক প্রদানে বাধ্য করেন।

১৭৪০ খ্রীঃ আলিবর্দী খাঁ বাংলার নবাব হন এবং তিনিও ইংরেজ East India Co.-র বি(দ্ধে একই নীতি নেন, যদিও এ(ত্রে মুর্শিদকুলীর মত তিনি এতটা কঠোর ছিলেন না। মুর্শিদকুলী ও আলিবর্দী উভয়েই অনেক সময়ই বেদিশী ব্যবসায়ীদের পণ্য চলাচলের ব্যাপারে হস্ত(প করতেন ও তাদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করতেন। তবে সামগ্রিকভাবে নবাবরা ইংরেজদের সঙ্গে কোনো প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে যেতে চাননি। এবং কোম্পানী বাংলা থেকে শুল্কমুক্ত(যে রপ্তানী বাণিজ্য চালাত তা তারা মেনে নেন, যে(ত্রে কোনো ব্যক্তি(গত ব্যবসায়ী নন, শুধুমাত্র East India Co.র মালই বাইরে যেত। একজন সমসাময়িক প্রত্য(দর্শী Scrafton ইংরেজদের প্রতি আচরণ প্রসঙ্গে এই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন যে আলিবর্দী ইউরোপীয়দের মৌচাকের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, যার মধু মানুষের উপকারে লাগলেও তাদের বিরক্ত(করলে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হয়।

কোম্পানীর অর্থনৈতিক সুবিধাকে বাংলার নবাবরা ব্যাহত করতে চাননি—এই আশায় যে তাদের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি বাংলায় সম্পদের বাড়বাড়ন্তের সূচনা করবে। তবে আলিবর্দী খাঁ কখনোই চাননি যে কোম্পানী এখানে তাদের সামরিক শক্তি(কে মজবুত করে গড়ে তুলুক। দা(ণাত্যে যখন ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব দেখা যায় তখন আলিবর্দী বাংলায় এই দুই যুযুধান প(কে সংযত করার সংকল্প নেন। এমনকী তাদের সামরিক শক্তি(র সুদৃঢ়ীকরণ প্রসঙ্গে তিনি নারাজ ছিলেন।

২.১ সিরাজ-উদ্-দৌলা ও ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী

১৭৫৬ খ্রীঃ সিরাজ তাঁর পিতামহ আলিবর্দী খানের উত্তরাধিকারী হিসাবে বাংলার মসনদে বসেন। তিনি ছিলেন আলিবর্দীর কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র। সিরাজ ছিলেন ত(ন, অনভিজ্ঞ, বদমেজাজী ও স্বাধীন। এমনকী তাঁর পরিবারের অনেকেই নবাব হিসাবে তাঁকে মেনে নিতে পারেননি। সিরাজের মাসী ঘসেটি বেগম, পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা খুব সত্ত্বরই এই ষড়যন্ত্রের আঁচ পান এবং ঘসেটি বেগমকে নজরবন্দী করে রাখেন মুর্শিদাবাদের মতিঝিল প্রাসাদে। এই ষড়যন্ত্রের পশ্চাতে ইংরেজদের হাত ছিল বলে তিনি মনে করতেন।

ইংরেজ East India Co.-র সম্পর্কে সিরাজের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক ছিল না। তিনি এটা পরিষ্কার করে দেন যে বাংলায় ইংরেজদের আবশ্যিক রূপে মুর্শিদকুলী খাঁ-র শর্তানুযায়ী বাণিজ্য করতে হবে। এ(ত্রে আলিবর্দী খাঁ-র মত তার মনোভাব যে খুব একটা নরম ছিল না তা বলাবাহুল্য। দস্তকের অপব্যবহার এবং কোম্পানীর কর্মচারীরা বিনাশুল্কে যে বেআইনী ব্যবসা চালাত সিরাজ তার বিরোধী ছিল। সিরাজ প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে তাদের বেআইনী ব্যবসা বন্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হন। কিন্তু দা(ণাত্যে ফরাসীদের পরাজিত করে ইংরেজদের আত্মবি(্বাস তুঙ্গে উঠেছিল এবং তারাও ত(ণ নবাবের এই ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না।

এই ব্যাপারে পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইংরেজরা এই সময় বাংলার মসনদে এমন এক পুতুল নবাবকে বসাতে চেয়েছিলেন যে তাদের স্বার্থে আঘাত করবে না। এই বিষয়ে দঃ ভারতে তারা সাফল্য লাভ করে এবং বাংলাতেও সেই একই ধরণের পদ্ধতি অনুসরণে আগ্রহী হয়। সুতরাং সিরাজ ও ইংরেজদের মধ্যে এক রক্ত((য়ী সংঘর্ষের পথ প্রস্তুত হয়।

দস্তকের অপব্যবহার ছাড়াও কিছু অন্যান্য কারণ ছিল যেগুলি সিরাজ ও ইংরেজের মধ্যে তিক্ত(তার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিল। প্রথমতঃ, সিরাজ যখন সিংহাসনে বসেন তখন এই নতুন নবাবকে আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ ইংরেজরা কোনো প্রথানুগ নজরানা পেশ করেনি, যেখানে অন্যান্য বিদেশী বণিকরা নবাবের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার্ঘ পেশ করতে কসুর করে নি। ইংরেজদের এই ধরণের উন্নাসিক আচরণ নবাবের পছন্দ হয় নি। এবং তার মনে এরূপ সন্দেহ দেখা যায়

যে ইংরেজরা তাঁর শত্রুদের সমর্থনকারী। **দ্বিতীয়তঃ,** সিরাজের অনুমতি ব্যতীত-ই ইংরজ East India Co.-র ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের সম্প্রসারণের কাজ শু(করে, যার পশ্চাতে ছিল চন্দননগরস্থিত ফরাসী আত্র(মণের ভীতি। সিরাজ একে তাঁর সার্বভৌম (মতার উপর হস্ত(প হিসাবে দেখেন। এবং ইংরাজ ও ফরাসী উভয়কেই তাদের দুর্গ নির্মাণের প্রয়াস রদ করতে আদেশ দেন। ফরাসীরা নবাবের নির্দেশ মেনে নিলেও ইংরেজরা তা মানতে অস্বীকার করে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে এই সমস্যার উৎস ছিল অতীতে নিহিত। বিপানচন্দ্র যথার্থভাবেই উল্লেখ করেছেন যে সামরিক শক্তি(হিসাবে ইংরেজদের বৃদ্ধি রোধ প্রসঙ্গে আলিবর্দী কোনো কার্যকরী পদ(প নেননি এবং ইংরেজরা তাদের দাবী চরিতার্থ করণের জন্য এরূপ শক্তি(র সাহায্য নিয়ে থাকত। মুর্শিদকুলী ও আলিবর্দী উভয়েই কোম্পানীর সামরিক (মতা প্রতিহত করতে পারত, যদিও তাদের শক্তি(তখন তলানিতে এসে ঠেকেছিল। এরা ইংরেজদের যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় ও তাদের সেভাবে গু(ত্ব দেয় না। এ(ত্রে সিরাজ ছিলেন সেই প্রথম নবাব যিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর প্রতিত্রি(য়া ব্যক্ত(করেন, তবে তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। **তৃতীয়তঃ,** সিরাজের রোষাগ্নি আরো জ্বলে ওঠে যখন তিনি জানতে পারেন যে তাঁর বি(দ্ধে ষড়যন্ত্রের অন্যতম সমর্থক ঘসেটি বেগমের একান্ত অনুগত কৃষ(দাসকে ইংরেজরা আশ্রয় দিয়েছে। সিরাজ বারংবার কৃষ(দাসকে প্রত্যর্পণের দাবী জানালেন। ইংরেজ গভর্নর ড্রেক তাতে আমল দেননি। ফলে নবাবের সার্বভৌম (মতা চূড়ান্তভাবে খর্ব হয়। কেননা মুঘল অনুশাসনের অধীনে তখনো পর্যন্ত কোম্পানীর মর্যাদা নিছক একজন জমিদারদের সমতুল্য ছিল। এর ফলে সিরাজের এরূপ ধারণা ঘনীভূত হয় যে সিরাজকে সরানোর জন্য ঘসেটি ও অন্যান্যরা ষড়যন্ত্র করেছিল তাতে কোম্পানীর হাত ছিল। সর্বোপরি এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে নবাবের আদর্শ অমান্য করে ইংরেজরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বাণিজ্য চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিল। তারা শুধু বাণিজ্যের জন্য শুল্ক দিতে অস্বীকৃত ছিল তা নয়, তার পাশাপাশি তাদের যে সকল পণ্য কলকাতায় প্রবেশ করত সে(ত্রেও ধার্য কর দিতে বিরূপ ছিল। সিরাজ উপলব্ধি করেছিলেন যে ইংরেজরা তার রাজ্যের মধ্যেই আর একটি রাজ্য গড়ে তুলতে চাইছে যেখানে নবাবের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তাদের কোনো কুণ্ঠা নেই। এমতাবস্থায় ইংরেজদের উচিৎ শি(া দিতে সিরাজ সংকল্পবদ্ধ হলেন।

সিরাজ ইংরেজদের সামরিক শক্তি(সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করতেন না এবং যথেষ্ট বিবেচনা ব্যতীতই নানা ইংরাজ বিরোধী পদ(প গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কাশিমবাজারে ইংরেজদের কুঠী দখল করেন এবং তারপর কলকাতার দিকে অগ্রসর হন। ১৭৫৬ খ্রীঃ সিরাজ অনায়াসেই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ জয় করেন এবং কলিকাতার নাম পরিবর্তন করে আলিনগর রাখেন। নবাব ইংরেজদের নৌকা করে কলিকাতা থেকে পালাতে দেননি, যাকে তাঁর তরফে একটি বৃহত্তর ভুল হিসাবে উল্লেখ করা যায়, কেননা পলায়নরত ১৪৬ জন ইউরোপীয়কে গ্রেপ্তার করে তিনি একটি স্বল্পায়তন ক(বন্দী করে রাখেন যে ক(টিতে পর্যাপ্ত আলোবাতাস চলাচলের সুযোগ ছিল না এবং এত সংখ্যক মানুষকে ধারণ করার মত পরিকাঠামো ছিল না, ফলে দমবন্ধ হয়ে সেখানে কিছু লোক মারা যায়। সমসাময়িক ব্রিটিশ পর্যবে(করা এই মর্মান্তিক ঘটনাকে 'ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডি' রূপে উল্লেখ করেন। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমসাময়িক ব্রিটিশ লেখকরা ভারতীয় শাসকদের ভালো চোখে দেখতেন না। এবং তারা তাদের নিষ্ঠুরতার প্রতীক রূপে গণ্য করতেন। তাই মনে করা হয় যে হলওয়েল প্রকৃত ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে দেখেছিলেন যাতে সিরাজকে খলনায়ক রূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা ছিল। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকরা চুলচেরা অনুসন্ধান ব্যতীত 'ব্ল্যাকহোল ট্রাজেডি'কে গ্রহণ করতে সম্মত নন।

ড্রেকের তত্ত্বাবধানে যে ব্রিটিশ নৌবহর কলিকাতা ছেড়ে কলকাতায় পৌঁছেছিল তা মাদ্রাজ থেকে আগত সাহায্যের অপে(ায় দিনগুণতে থাকে। এমতাবস্থায় ইংরাজ কর্তৃপ(একটি শক্তি(শালী সামরিক বাহিনীসহ নৌবহর অ্যাডমিরাল ওয়াটসন ও কর্ণেল ক্লাইভের নের্তৃত্বে কলিকাতা পুণ(দ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ক্লাইভ কলিকাতা জয় করেন

এবং নবাবের নিকট থেকে (তিপূরণ দাবী করেন। ফলে নবাব দ্বিতীয়বারের জন্য কলিকাতা আত্র(মণ করেন। তবে এ(ত্রে ইংরেজদের সঙ্গে কোনো প্রকাশ্য সংঘর্ষে না গিয়ে কলিকাতায় পদার্পণ করে তিনি তাদের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে লিপ্ত হন। সেখানে ক্লাইভ বলপূর্বক নবাবকে দিয়ে আহমেদনগরের সন্ধি (১৭৫৭) স্বা(র করান। এবং এই সন্ধির দ্বারা সিরাজ ইংরেজ কোম্পানীর আধিপত্য স্বীকার করে নেন এবং তাদের কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেন।

তবে ইংরেজরা এতে সন্তুষ্ট ছিল না। কারণ তাদের উচ্চাকাঙ(া ছিল গগনচুম্বী। তারা উপলব্ধি করে যে যতদিন না বাংলায় পুতুল নবাবের শাসন কায়েম হচ্ছে ততদিন তাদের চূড়ান্তভাবে স্বার্থ সিদ্ধি ঘটবে না। ক্লাইভ এ বিষয়ে তাঁর তৎপরতা দেখাতে শু(করেন এবং নবাবের প্রধান সামরিক সেনানী মীরজাফরের সঙ্গে একটি গোপনচুক্তি(বদ্ধ হন। ক্লাইভ যদি মুর্শিদাবাদ আত্র(মণ করেন তাহলে নবাববাহিনীর একাংশকে নিজের দলে টানতে পারবেন বলে ইংরেজদের নিকট মীরজাফর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, যার বিনিময়ে পরবর্তী নবাব হিসাবে বাংলার মসনদে ক্লাইভ মীরজাফরকে অভিষিক্ত(করার আ(াস দেন। ক্লাইভ ও মীরজাফরের এই ষড়যন্ত্রের অপরাপর শরিক ছিলেন মানিকচাঁদ, উমিচাঁদ, জগৎ শেঠ এবং সিরাজের অন্যান্য শত্রুরা। যাবতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর ক্লাইভ নবাবকে আত্র(মণ করতে উদ্যত হন এবং মুর্শিদাবাদ থেকে ২২ মাইল দূরে পলাশী নামক স্থানে সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই বাঁধে (২৩ শে জুন, ১৭৫৭)। সিরাজের তরফ থেকে সামান্য হলেও প্রতিরোধের চেষ্টা পরিল(িত হয়, যদিও মীরজাফর ও রায়দুর্লভের নির্দেশে তার বাহিনীর বেশীরভাগ সৈন্যই নীরবদর্শকের ভূমিকা পালন করে। মীরমদন ও মোহনলালের নেতৃত্বে সৈন্যদলের একটি ছোট অংশ সাহসের সঙ্গে লড়াই করে। তাঁর অনুগত সহযোগীদের পরামর্শে সিরাজ রণ(ত্র ত্যাগ করেন, কেননা তাঁর পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। কিছুকাল পরে সিরাজ গ্রেপ্তার হন এবং মীরজাফরের পুত্র মীরণের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। আর এইভাবে পলাশীর যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

২.২ পলাশীর যুদ্ধের তাৎপর্য

বাঙালী কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' কবিতায় এই মর্মে (ো ভ প্রকাশ করেছিলেন যে এই যুদ্ধ ভারতের বুকে দুর্দিনের অমাবস্যা বয়ে নিয়ে আসে। এই যুদ্ধকে তিনি স্বাধীন ভারতের শেষ ও বিদেশী আধিপত্যের সূচনাকাল হিসাবে দেখেছিলেন। শুধু কবি নবীনচন্দ্র সেনই নন, অনেক পেশাদার ঐতিহাসিকরা পরবর্তীকালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের শোচনীয় পরাজয়ের বিষয়ে তাদের আবেগকে প্রশমন করতে পারেননি, এই সম্পর্কে তাদের মনে যে রোমান্টিক আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে বাঙালীর জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ নিহিত ছিল।

পলাশীর যুদ্ধকে সামরিক দিক থেকে একটি বড় মাপের যুদ্ধ বলা যায় না। ক্লাইভের (ুদ্র বাহিনী নবাবের তরফ থেকে কোনো গু(তর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। তবে এই যুদ্ধের একমাত্র গু(ত্ব এই যে এর মাধ্যমে ভারতীয় সামরিক বাহিনী অপে(া পশ্চিমী সামরিক প্রযুক্তি(র উৎকর্ষ ফুটে ওঠে। এবং প্রমাণ হয় যে শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিকদের একটি সামান্য অংশ সংখ্যাবহুল ভারতীয় বাহিনীকে পারজিত করতে পারে। ফলে ভারতীয় সৈনিকদের দুর্বলতার দিকটি দষ্টিগোচর হয়। **দ্বিতীয়তঃ,** পলাশীর যুদ্ধের পরিণতিতে ভারতে ব্রিটিশ বিজয়ের সুচনা ঘটে এবং ব্রিটিশরা মুর্শিদাবাদের তক্ত-এ মীরজাফরকে বসিয়ে এক পুতুল সরকারের প্রচলন করেন। বাস্তবিকভাবে পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশরা সারা বাংলার প্রভূতে পরিণত হয়। তাদের সামরিক মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজনৈতিক অবস্থান সাফল্য সহকারে ব্যপ্ত হয়। **তৃতীয়তঃ,** ইংরেজদের এই বিজয় ছিল বাংলার অর্থনৈতিক সম্পদ নির্গমনের দ্যোতক, যা ইতিহাসে 'পলাশীর লুণ্ঠন' নামে খ্যাত। কোম্পানী মীরজাফরের কাছ থেকে (তিপূরণ বাবদ ১,৭৭,০০,০০০ টাকা আদায় করে। নতুন নবাবের

কাছ থেকে রবার্ট ক্লাইভ দুই মিলিয়ন অর্থ আদায় করেন। এছাড়া চব্বিশপরগণার জমিদারী ইংরেজদের হয়। বস্তুত পলাশী-পরবর্তী দিনগুলিতে বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ ইংল্যাণ্ডে পাচার হয়, যার ফলে বাংলার অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। বাংলার সম্পত্তির মূল্যে ব্রিটিশরা ভারতের বাকি অংশ জয় করে। এমনকী ফরাসীদের পরাজিত করার জন্য ইংরেজদের পে(প্রয়োজনীয় রসদ বা তহবিল বাংলা থেকেই যায়।

তবে সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চায় পলাশীর যুদ্ধকে সেভাবে গু(ত্ব দেওয়া হয় নি। একথা বলা হয়ে থাকে যে পলাশীর যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশদের ভারত বিজয় সম্পূর্ণ হয় নি। যদি ইংরেজরা সেই সময় ভারতে অন্য কোনো যুদ্ধে পরাজিত হত তবে পলাশীর যুদ্ধ বাংলার ইতিহাসে একটি (ুদ্র অধ্যায় রূপে বিবেচিত হত। পলাশী অপে(া বক্সারের যুদ্ধের গু(ত্ব ছিল অধিক, যেখানে কোম্পানীর সামরিক বাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে উচ্চতর সামরিক কৌশল অবলম্বনের সুযোগ পেয়েছিল। সমাজ, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পলাশী বক্সার অবশ্য কোনো বিভেদরেখা গড়তে পারে না। সর্বোপরি একথা স্বীকার করতেই হয় যে ব্রিটিশদের ভবিষ্যৎ ভারত জয়ের পথ পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে অনেক মসৃণ হয়ে ওঠে। আর এখানেই এই যুদ্ধের তাৎপর্য নিহিত ছিল।

২.৩ নবাব মীরজাফর (১৭৫৭-'৬০)— নবাব মীরকাশিম (১৭৬০-'৬৩)—বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪)

ক্লাইভ ও মীরজাফরের মধ্যে গোপন চুক্তি(অনুসারে ইংরেজ East India Co. পলাশীর যুদ্ধের পরে মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসায়। তবে তাঁর ভূমিকা একজন ত্রীড়নক অপে(া বেশী ছিল না। কোম্পানীর কর্মচারীদের মীরজাফর প্রচুর উপঢৌকন দিয়েছিলেন, যে(ত্রে ক্লাইভ পরবর্তীকালে হিসাব করে দেখেছিলেন যে এই পুতুল নবাবের নিকট থেকে ইংরেজরা 30 মিলিয়ন অর্থ আদায় করেছিলেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের দাবী মেটাতে গিয়ে মীরজাফরের কোষাগার শূন্য হয়ে যায় এবং তিনি শীঘ্রই তাঁর ভুল বুঝতে পারেন ও অনুতপ্ত হন। এই সময় East India Co. নিছক নৌবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং কোম্পানী নবাবদের উপর তাঁর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আরোপ করতে স(ম হয়েছিল ও বাংলার সম্পদ শোষণে রত ছিল। ক্লাইভ উল্লেখ করেছিলেন যে এই সময় বাংলায় যে অরাজকতা, বিভ্রান্তি, দুর্নীতি, শোষণ এবং উৎকোচ গ্রহণের প্রবণতা পরিলি(ত হয়েছিল তা অন্যত্র দেখা যায় না। কোম্পানীর কর্মচারীদের নবাবের নিকট প্রত্যাশা ছিল অনেক। তবে নবাব শীঘ্রই উপলব্ধি করতে স(ম হন যে কোম্পানীর কর্মচারীদের চাহিদাপুরণের মত আর আর্থিক সামর্থ তাঁর নেই। এদিকে ইংরেজরা মীরজাফরের উপর চাপ সৃষ্টি করতে শু(করল এবং নবাব বারংবার তাদের দ্বারা অপমানিত ও অপদস্ত হতে লাগলেন। ইংরেজদের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাসের জন্য মীরজাফর গোপনে চুঁচুড়াস্থিত ডাচদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন এবং তাদের সঙ্গে নবাবের একটি সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিল। মীরজাফরের পূর্বানুমতি ছাড়াই নেদারল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা ১৭৫৯ খ্রীঃ হুগলী আত্র(মণ করল। এবং বিদেরার নৌ যুদ্ধে ডাচবাহিনী ইংরেজদের হাতে শোচনীয় ভাবে পরজাতি হল। ডাচদের সঙ্গে মীরজাফরের সম্পর্ক তার প্রতি ইংরেজদের অসন্তোষ অনেকটা বাড়িয়ে দিল। এবং তাদের উপর ডাচ আত্র(মণের জন্য নবাবকেই দায়ী করল, তবে এ ব্যাপারে তাদের হাতে কোনো অকাট্য প্রমাণ অবশ্য ছিল না। ১৭৬০ খ্রীঃ ক্লাইভের পরবর্তী গভর্নর ভ্যানিসটার্টের পদ লাভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মীরজাফরকে (মতাচ্যুত করে তার স্থলে তার জামাতা মীরকাশিমকে নবাবরূপে অভিষিক্ত(করেন। আর বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী তারা মীরকাশিমের কাছ থেকে লাভ করে। এছাড়া ইংরেজরা প্রায় ২৯ ল(টাকার উপহার নতুন নবাবের কাছ থেকে পায়, যেখানে ভ্যানিসস্টার্ট ও তার পরিবার পেয়েছিল ২,০০,০০০ টাকার পরিমাণ অর্থ। ভ্যানিসস্টার্ট ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদের

লোভ ও অর্থলিপ্সা স্যার আলফ্রেড লায়াল শব্দের মাধ্যমে এরূপে ফুটিয়ে তোলেন যে ইঙ্গ-ভারতীয় ইতিহাসের পাতায় এই একটিমাত্র অধ্যায় ইংরেজরা যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল তা চূড়ান্তভাবে নিন্দনীয়।

ইংরেজরা এই মর্মে মীরকাশিমকে বাংলার মসনদে বসায় যে তিনি তাদের ইচ্ছা ও স্বার্থনুযায়ী কাজ করবেন। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাগুলি তাদের কল্পতিপথে এগোয়নি। মীরকাশিম ছিলেন খুব স্বাধীনচেতা, কর্মঠ ও বি(স্ত। তিনি বিদেশী আধিপেত্যের কবল থেকে মুক্তি(চেয়েছিলেন আর একথা উপলব্ধি করেন যে স্বাধীন ও (মতাশালী হবার জন্য প্রয়োজন পূর্ণ কোষাগার ও সুদ(সামরিক বাহিনী।

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে তত্ত্বগতভাবে শাসন(মতা নবাবের হাতে থাকলেও কোম্পানীর হাতে ছিল সামরিক শক্তি(ও নবাব কোম্পানীর ব্যবয়াসীদের এদেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ঢালাও সুযোগ দান করেছিল। যখন কোম্পানীর প্রতিপত্তি নবাবকেও ছাপিয়ে গেল তখন শহরতলীর উৎপাদকরা কোম্পানীর এজেন্টদের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। কোনো ব্যবসায়ী দুর্বত্তদের সাহায্য নিয়ে অনেক সময়ই নবাবের কর্মচারীদের নিগ্‌(য় করতে পারত। আর যেহেতু কোম্পানীর হাতে কোনো প্রত্য(শাসন(মতা ছিল না তাই তার বণিকেরা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে স্বেচ্ছাচার করে বেড়ালেও এর দায়িত্ব কোম্পানীর উপর বর্তাত না। মীরকাশিম পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে চান ও পুনরায় শান্তি শৃঙ্খলা আপন করতে চান, যাতে করে কোষাগারের রাজত্ব সরবরাহ নিশ্চিত করা যায় ও সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন সম্ভব হয়। ইংরেজ ও নবাবের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কারণরূপে পুনরায় চিহ্নি(ত হয় ব্যক্তি(গত অবাধ বাণিজ্য ও দস্তকের অপব্যবহার। নবাব দাবী করেন যে দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য 1717-র ফর্মান অনুযায়ী সাধিত হবে, যে(ত্রে কোনো নড়চড় থাকবে না। মীরকাশিম কোম্পানীর কর্মচারীদের দ্বারা সম্পন্ন শুল্কমুক্ত(ব্যক্তি(গত বাণিজ্যের বিরোধী ছিলেন, যার ফলে দেশীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ (ু্ন হচ্ছিল, কেননা ভারতীয়দের কর বাবদ অর্থ প্রদান করতে হলেও বিদেশী বণিকরা এ ব্যাপারে পূর্ণ অব্যাহতি ভোগ করতেন। মীরকাশিম এই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেন কোম্পানীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপ(র সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যা বিফলে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নবাব তখন দেশীয় বাণিজ্যের উপর সব ধরণের শুল্ক তুলে নেন আর এভাবে ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও ছাড় পায় এবং ইংরেজদের একচেটিয়া অধিকার ব্যহত হয়। কিন্তু ইংরেজ ব্যবসায়ীরা তাদের সঙ্গে দেশীয় বণিকদের এই সমক(তাকে মেনে নিতে পারে নি।

দেশীয় বাণিজ্য সংক্র(ান্ত সমস্যা ছাড়াও কিছু রাজনৈতিক কারণেই ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাশিমের মনোমালিন্য দেখা দেয়। মীরকাশিম তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন, যা ছিল কোম্পানীর (মতাকেন্দ্র কলকাতা থেকে বেশ দূরে। মুঙ্গেরে নবাব একটি সৈন্যদল গঠন করেন, এবং তাদের দ(ইউরোপীয় সেনানীদের মাধ্যমে প্রশি(ণ দেন। মীরকাশিম বৈধ শাসকরূপে যেভাবে দিল্লীর মুঘল সম্রাটের রাজনৈতিক অনুমোদন আদায় প্রসঙ্গে উঠে পড়ে লাগেন তা ইংরেজদের ঈর্ষার কারণ হয়। কারণ একসাথে বাংলায় দুজন সার্বভৌম কর্তৃত্বের অবস্থান অসম্ভব ছিল। মীরকাশিম নিজেকে একজন স্বাধীন শাসক হিসাবেই দেখতেন, যেখানে ইংরেজরা আশা করেছিল যে তিনি তাদের হাতের পুতুল হবেন। ফলতঃ নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক একপ্রকার অনিবার্য হয়ে ওঠে ও গিরিয়া, উদয়নালা প্রভৃতি যুদ্ধে মীরকাশিম ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন ও অযোধ্যায় আশ্রয় নেন।

অযোধ্যায় সমকালীন মুঘল সম্রাট ২য় শাহ্ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলার সমর্থন আদায় করে মীরকাশিম ব্রিটিশের বি(দ্ধে একটি বড় ধরণের চক্র(ান্তের রূপকার হন, কিন্তু উপরোক্ত(তিনজনের সম্মিলিত বাহিনী ১৭৬৪র ২২ সে অক্টোবর বক্সারের প্রান্তরে জেনারেল হেক্টর মুনরোর অধীনস্থ ইংরেজ বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। বক্সারের যুদ্ধ ভারতের ব্রিটিশ শক্তি(র অভ্যুত্থানের ইতিহাসে বিস্তৃত অধ্যায়ের পটভূমিকায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদ(প রূপে গণ্য হয়। পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের সেনাবাহিনী নবাবের তরফ থেকে সেরূপ কোনো গু(তর

প্রতিরোধের সম্মুখীন না হলেও বক্সারে ব্রিটিশরা তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সুযোগ পায়। এখানে তাদের প্রতিপ(ছিল যথেষ্ট শক্তি(শালী ও বৃহৎ এবং তারা পলাশীর সৈন্যদের মত নীরব দর্শক ছিল না। বক্সারের যুদ্ধের পরিনতিতে যুদ্ধবিদ্যা সংক্র(ান্ত প্রতিটি (ে ত্রে দেশীয় বাহিনীর অপদার্থতা প্রতিপন্ন হয়। **দ্বিতীয়তঃ,** পলাশীর মাধ্যমে নবাব ও ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শু(হয়েছিল সেখানে ইংরেজরা বিজেতারূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর বক্সারের পর সামরিক শক্তি(ও (মতা ব্যতীত নবাব ব্রিটিশদের নিছক এজেন্টে পর্যবসিত হন। এই সময় নবাবের অস্তিত্ব এতটাই হ্রস্বীকৃত হয়ে পড়ে যে তার সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। **তৃতীয়তঃ,** এই যুদ্ধে ইংরেজরা কেবল মীরকাশিমকেই পরাজিত করেনি, মুঘল সম্রাটও তাদের হাতে পরাস্ত হন। ফলে এর প্রতীকী গু(ত্ব ও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সর্বোপরি রাজনৈতিক ও আর্থিকভাবে বক্সারের পরিণতিতে যে গু(ত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে তা হল নবাবের হাত থেকে কোম্পানীর হাতে সরকারী (মতার হস্তান্তকরণ। এই সময় কোম্পানী তার নৌবাণিজ্যিক শক্তি(রূপে যে ভাবমূর্তি তা ঝেড়ে ফেলে রাজ্যাধিপতির ভূমিকা নেয়। বক্সারের অর্থনৈতিক পরিণাম ও ছিল সমানভাবে গু(ত্বপূর্ণ। এর ফলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশে কোম্পানী বাহাদুরের মর্যাদা পায়।

২.৪ ব্রিটিশদের দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৭৬৩ তে মীরজাফর ইংরেজরা বাংলা মসনদে বসায় ও ১৭৬৫ খ্রীঃ ক্লাইভ গভর্নর হিসাবে কলকাতায় আসেন। এই সময় পরিস্থিতি Co র প(আনার জন্য ক্লাইভ অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় দেন এবং Co-র আধিপত্যের ভিত মজবুত করে গড়তে উৎসাহী হন। মুঘল সম্রাট শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলা ইতিমধ্যেই বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং সুজা-উদ-দৌলা অযোধ্যায় ফিরে যান, শাহ-আলম এলাহাবাদ। অবশ্য এর বিনিময়ে ক্লাইভ তাঁর থেকে বার্ষিক ২৬,০০,০০০ টাকার বিনিময়ে বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের অধিকার বা দেওয়ানী লাভ করেন।

এর অর্থ হল কোম্পানী বাংলা সুবার রাজস্ব আদায়ের আইনগত স্বীকৃতি লাভ করল। দেওয়ানী লাভের পূর্বে বাংলার রাজস্ব প্রসঙ্গে কোম্পানী কোনো আইনগত সুবিধা ভোগ করত না, সে(ত্রে বাস্তবিকভাবে তাদের অবস্থান ছিল ১৭১৭-য় প্রণীত মুঘল ফর্মানের নির্দেশাবলীর ন্যায় যার বলে তারা বাংলার বুকে বাণিজ্য করার অধিকার পায়। কিন্তু দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার কিছুটা বৈধতা লাভ করে, আর এর মধ্যেই দেওয়ানীর তাৎপর্য নিহিত থাকতে দেখি। এখন কোম্পানী বাহাদুর বাংলা সুবার সার্বভৌম কর্তায় পরিণত হয়, যাদের কর্তৃত্ব নিয়ে কোনো প্র(ের উদ্রেক হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ এই সময় বাংলার নবাব কোম্পানীর অধস্তন ভৃত্য ব্যতীত আর কোনভাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারেনি। ক্লাইভ চাইলে দিল্লীতেও তাঁর আধিপত্য বিস্তার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি কোম্পানীর কর্তৃত্ব সীমিত রাখতে মনস্থ করলেন।

ক্লাইভ যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে অলোচ্য সময়ে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মত শক্তি(কোম্পানীর নেই, আর তাই তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে বাংলার শাসনভার, দেওয়ানী লাভের পর, কোম্পানী প্রত্য(ভাবে গ্রহণ করবে না। কোম্পানীর মনোনীত একজন ডেপুটি নবাব রাজস্ব আদায় করবে। এই সময় ইংরেজরা মীরজাফরের পুত্র নিজাম-উদ্-দৌলার সঙ্গে একটি চুক্তি(স্বা(র করে। এই চুক্তি(অনুযায়ী ডেপুটি সুবাদার বা নবাব কোম্পানীর প্রতিনিধিস্বরূপ এবং কোম্পানীর প(থেকে বাংলা সুবার রাজস্ব আদায় করবে। বস্তুত তখন বাংলার বুকে এক দ্বৈত শাসনব্যবস্থা দেখা যায়— নবাব পুলিশ ও বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব সামলাবে আর কোম্পানী রাজস্বজনিত (মতা ভোগ করবে। বাস্তবে

কোম্পানী বাংলায় শাসনকর্তায় পরিণত হয়, কেননা তার সামরিক (মতা ছিল ব্যাপক। নবাব শুধুমাত্র বিচারবিভাগীয় প্রশাসনই দেখতেন, তবে কোম্পানীর মনোনীত ডেপুটি নবাবকে এই (মতা হস্তান্তরের জন্য নবাবের উপর চাপ দেওয়া হয়। ক্লাইভ এর মস্তিষ্ক প্রসূত এই ব্যবস্থা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা (Diarchy বা Dual Govt.) নামে পরিচিত। এর অর্থ দাঁড়ায় ডেপুটি নবাব কোম্পানীর প(থেকে রাজস্বের পাশাপাশি বিচারবিভাগীয় দায়িত্ব সম্পন্ন করবে আর এরূপে নায়েব-দেওয়ান এবং নায়েব-নাজিমের (মতার সমন্বয়সাধন করা হয়।

মুঘলদের অধীনে প্রাদেশিক সরকারের দুটি গু(ত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল— দেওয়ানী ও নিজামত। রাজস্ব সংগ্রহ এবং পৌর বিচারবিভাগীয় প্রশাসনের দায়িত্ব থাকত দেওয়ানের ওপর, যিনি ছিলেন দেওয়ানী বিভাগের প্রধান। অপরদিকে ফৌজদারী বিচার ও পুলিশী ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতেন নিজামৎ নামক বিভাগটি যার প্রধান কর্তা ছিলেন সুবাদার বানাজিম। দেওয়ানীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য হল যে এই সময় কোম্পানী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজস্ব সংগ্রহের পাশাপাশি বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব সম্পন্ন করবে, আর এরূপ নায়েব-দেওয়ান এবং নায়েব-নাজিমের (মতার সমন্বয়সাধন করা হয়।

মুঘলদের অধীনে প্রাদেশিক সরকারের দুটি গু(ত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল— দেওয়ানী ও নিজামৎ। রাজস্ব সংগ্রহ এবং পৌর বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের দায়িত্ব থাকত দেওয়ানের ওপর, যিনি ছিলেন দেওয়ানী বিভাগের প্রধান। অন্যদিকে ফৌজদারী বিচার ও পুলিশী ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতেন নিজামৎ নামক বিভাগটি যার প্রধান কর্তা ছিলেন সুবাদার বা নাজিম। দেওয়ানীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য হল যে এই সময় কোম্পানী বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার রাজস্ব সংগ্রহের পাশাপাশি পৌর বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব লাভ করে আর এইভাবেই দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। এর বলে ইংরেজরা দেওয়ানী ও নিজামৎ উভয় বিভাগের উপরই তাদের (মতা হারায় বা তারা তাদের প্রয়োগের সুযোগ পায় না। ক্লাইভ প্রত্য(ভাবে কোম্পানীকে বাংলার শাসনে নিযুক্ত(করতে চায়নি, যে দেওয়ানী প্রশাসন চালাবার জন্য এক বিশাল সংখ্যক কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল, **দ্বিতীয়তঃ,** ভারতের জটিল এবং অভিনব রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার মত যথেষ্ট জ্ঞান ব্রিটিশ কর্মচারীদের ছিল না, পার্সিভাল স্পীয়ার যথার্থই মনে করেন যে প্রশাসন যন্ত্র মুঘল খেতাব ইত্যাদি অলঙ্করণ সহ ভারতীয়রূপেই থেকে যায়, কিন্তু আসল (মতা চলে যায় কোম্পানীর হাতে।

১৭৬০—'৬৫ পর্যন্ত ক্লাইভ ভারতে ছিলেন না এবং তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে বাংলার বুকে একাধিক গু(ত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিকাশ ঘটে। ১৭৬০ মীরজাফর ভ্যান্সিটার্ট কর্তৃক বলপূর্বক (মতাচ্যুত হন এবং ক্লাইভ এর উত্তরসুরী এই ভ্যান্সিটার্ট মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমকে বর্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রামের জমিদারী এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধার প্রে(তে বাংলার নবাবী বিত্র(ী করে দেন। **দ্বিতীয়তঃ,** বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয় ইংরেজদের অবস্থান অনেক বেশী মজবুত করে তোলে এবং তাদের সামরিক উৎকর্ষ সবাইকে ছাপিয়ে যায় এবং বাংলার নবাবের প(তাদের শক্তি(রোধ করা অসম্ভবরূপে প্রতিপন্ন হয়। ব্রিটিশদের এই সুদিনে ক্লাইভ কলকাতায় পদার্পন করে।

এই ধরণের সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে ক্লাইভ তাদের (মতার কেন্দ্র বাংলাকে রাজনৈতিক বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত(রাখতে মনস্থির করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরিস্থিতি সুবিধাজনক হলেও কোম্পানীর কার্য-কলাপের ল(্য তখনো স্থির হয়নি।

ক্লাইভ এর পূর্বে কোম্পানীর ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরা অনেক কথাই ভেবেছিলেন এবং দেওয়ানী লাভের পর তাদের নিকট সেই সুবর্ণ সুযোগ এল, যার বলে কোম্পানীর (মতা উত্তরোত্তর বর্ধিত হবে। তবে বিচ(ণ ক্লাইভ কোম্পানীর (মতা সেই সময়ের মত সীমিত রাখারই প(পাতী ছিলেন। এবং দেওয়ানীর তাৎপর্য তাঁর নিকট অবিদিত ছিল না। দেওয়ানী লাভের ফলে কোম্পানী প্রত্য(ভাবে বাংলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেল। তবে প্রশাসনিক (মতাগ্রহণের

চরম(ণ যে এখন আসেনি তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ফলত কোম্পানীর মনোনীত ডেপুটি নবাব রাজস্ব আদায়ের অধিকার পায়। বাস্তবিকভাবে এই নতুন দ্বৈত শাসনে বাংলার নবাবের হাতে রইল বিচার ও পুলিশী (মতা, আর কোম্পানী পেল রাজস্ব আদায়ের (মতা। এই দ্বৈত শাসনব্যবস্থা Diarchy রূপে ইতিহাসের বুকে খ্যাত হয়ে আছে। এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থাতে কোম্পানী যে ধরণের (মতা ভোগ করত তা সীমাহীন ছিল। বলা যেতে পারে এইভাবে যে ইঙ্গ-মুঘল শাসন কাঠামো জন্ম নিল সেখানে কোম্পানী চরম কর্তৃত্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করল। সর্বোপরি দ্বৈতশাসনব্যবস্থাই ক্লাইভ শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। কারণ তিনি জনসম(কোম্পানীর প্রকৃতস্বরূপ উদঘাটন করতে চাননি। তাঁর মনে হয়েছিল যে এর ফলে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির ইংল্যান্ডের প্রতি ঈর্ষার উদ্রেক হবে ও এতে বাংলা বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির রণ(ত্রে পরিণত হবে।

দ্বৈত শাসনব্যবস্থা ইংরেজদের নিকট যথেষ্ট লাভজনক রূপে বিবেচিত হয়। তারা দায়িত্ব ছাড়াই (মতা ভোগ করতে পারে। তবে এই ব্যবস্থা আমরা সফল বলতে পারি না। ঐতিহাসিক র‍্যামসে ম্যুর মনে করেন দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বা diarchy ব্যর্থতার দিকে এগিয়েছিল। এর ফলে সবচেয়ে (তিগ্রস্ত হয় উৎপাদকরা, কারণ তাদের কথা নবাব বা কোম্পানী কেউই ভাবত না। কোম্পানী নিযুক্ত(লোভী রাজস্ব কর্মচারীরা তাদের যারপরনাই অপদস্ত করত। আর এইভাবে যে ব্যাপক লুণ্ঠন বাংলার বুকে চলেছিল সেকথা পার্সিভাল স্পীয়ার বলেছেন। কোম্পানীর বেআইনী ব্যবসা দ্বিগুণ বেড়েছিল আর গবীর বাঙালী তাঁতীরা কমদামে তাদের উৎপাদিত পণ্য কোম্পানীর কর্মচারীদের বিত্র(ী করতে বাধ্য থাকত। বাংলার রাজস্ব থেকে ভারতীয় দ্রব্য খরিদ করে তা বিদেশে বেচে ইংরেজরা চড়া মুনাফা লাভ করে। ১৭৬৬—'৬৮র মধ্যে প্রায় £ ৫.৭ মিলিয়ন অর্থ বাংলা থেকে শোষিত হয়েছিল। এদেশ থেকে যে পরিমাণ সম্পদ নির্গমন হত তার ভয়াবহতা ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত জনক ক্লাইভেরও নজরে পড়েছিল। এবং তিনিও এই ব্যাপারে এই মর্মে খেদোক্তি(প্রকাশ করেছিলেন যে বাংলা ব্যতীত অন্য কোনো দেশে লুণ্ঠন ও শোষণের এহেন তান্ডবলীলা চলেনি। দ্বৈতশাসনব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফুটে ওঠে ১৭৭০-এর দুর্ভি((যাকে মানব ইতিহাসের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় রূপে চিহ্নি(ত করা যায়। দ্বৈতশাসনব্যবস্থায় যে কুফলগুলি পরিদৃষ্ট হয়েছিল তার ফলে ইংরেজরা রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়। ১৭৭২ খ্রীঃ ওয়ারেন হেস্টিংস-এর পদার্পনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা লোপ পায় এবং কোম্পানী দেওয়ানী বা রাজস্ব প্রশাসনের প্রত্য(দায়িত্ব স্বীকার করে। এই সময় কোম্পানী তার বাণিজ্যিক ধ্যানধারণা ঝেড়ে ফেলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব গঠনে মন দেয়।

২.৫ গ্রন্থপঞ্জি

A. M. Khan — The Transition in Bengal.

Sirajul Islam — The Permanent Settlement in Bengal.

P. J. Marshall — Bengal, the British Bridgehead.

Sekhar Bandyopadhyay — From Plassey to Partition.

২.৬ অনুশীলনী

১। নবাব সিরাজের সঙ্গে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধের কারণ আলোচনা কর।

২। পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে বক্সারের যুদ্ধের ঐতিহাসিক গু(ত্বের পার্থক্য কোথায়।

৩। পলাশীর যুদ্ধের ঐতিহাসিক গু(ত্ব লেখ।

৪। বক্সারের যুদ্ধের প্রধান কারণ আলোচনা কর।

৫। দিওয়ানী— লাভের ঐতিহাসিক গু(ত্ব আলোচনা কর।

৬। দিওয়ানী লাভের ফলাফল এবং রাজনৈতিক গু(ত্ব আলোচনা কর।

একক ৩ ❑ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সীমান্ত বিস্তার নীতি

গঠন

৩.০ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব
৩.১ ইঙ্গ-মহীশূরের সম্পর্ক
৩.২ মহীশূরের পতনের কারণ
৩.৩ ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক
৩.৪ মারাঠাদের পতনের কারণ
৩.৫ রঞ্জিত সিংহের পরবর্তীকালীন ইঙ্গ-শিখ দ্বন্দ্ব
৩.৬ শিখদের পতনের কারণ
৩.৭ ১৭৭৩ রেগুলেটিং আইন এবং পিটের ভারত আইন (১৭৮৪)
৩.৮ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি
৩.৯ লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক গৃহীত রাজ্য বিস্তার নীতি
৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি
৩.১১ অনুশীলনী

পশ্চিম ও দ(িণ ভারতে কোম্পানীর রাজ্যবিস্তার— অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ও ব্রিটিশ রাজের উত্থান— রেগুলেটিং ও পিটের ভারত আইন, ১৭৯৩ ও ১৮১৩ খ্রীঃ র চার্টার আইন— অধীনতামূলক মিত্রতা থেকে সম্প্রসারণ নীতি— হেস্টিংস থেকে ডালহৌসী।

৩.০ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব

ইউরোপীয়দের পদার্পনের ফলে ভারত ইউরোপীয় রাজনীতির এক ত্রীড়া(ে ত্রে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স, সারা বি(ে জুড়ে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক আধিপত্য স্থাপনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত ছিল। ১৭৪০—'৬৩ খ্রীঃ-র মধ্যে যে সকল ইউরোপীয় যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড লিপ্ত ছিল সেই সূত্রে ভারতেও তাদের মধ্যে লড়াই লাগে। ১৭ শতকের শেষার্ধ্বে ইংরেজরা ভারতের বুক থেকে পর্তুগীজ ও ডাচদের সরিয়ে দিতে স(ম হয়েছিল এবং তখন তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফ্রান্স। উভয় দেশের ল(্য বণিকেরাই ভারতে বাণিজ্য ও সম্পদের উপর নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিল। তাদের উভয়ের ল(এক হওয়ায় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইংরেজ ও ফরাসীরা ভারতে দুর্গ নির্মাণ ও আত্মর(ার জন্য সৈন্য সঞ্চয়ে মন দিয়েছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য মুঘল সাম্রাজ্যে যে পতন ঘটেছিল তাতে ফরাসী ও ব্রিটিশরা তাদের ল(পূরণের সুবর্ণ সুযোগ খুঁজে পেয়েছিল। যখন ভারতীয় অভিজাতরা কেন্দ্রে তাদের (মতা বিস্তার করতে চেয়েছিল তখন তারা এই সকল বিদেশী শক্তি(কে সাহায্য করতে ইচ্ছুক হয়। কারণ এদের যুদ্ধনৈপুণ্য প্র(োতীত ছিল। ইংরেজ ও ফরাসীরাও ভারতীয় রাজাদের এই আহ্বানে সাড়া দিতে দ্বিধা করেনি। কারণ তারা জানত যে তাদের মদতপুষ্ট যে প(জিতবে তাদের নিকট থেকেই তারা সুবিধা নিতে তৎপর হবে।

১৭৪২ খ্রীঃ ইউরোপ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। ভারতেও ১৭৪২-৬৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চোখে পড়বে। দঃ ভারতের কর্ণাটক ছিল তাদের সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রস্থলস্বরূপ। দঃ ভারতে ইংরেজরা মাদ্রাজ

ও ফরাসীরা পন্ডিচেরীতে বসতি স্থাপন করেছিল। এরা উভয়েই স্থানীয় রাজনৈতিক চালচিত্রে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছিল। এখানে এদের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ হয়েছিল এবং ১৭৪৫ ইংরেজ নৌবহর যখন ফ্রান্সের যুদ্ধ জাহাজগুলিকে ধ্বংস করেছিল তখন ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছিল। এই সময় ফরাসীদের নেতা ছিলেন অসাধারণ কূটনীতিজ্ঞ পণ্ডিচেরীর শাসক দুপ্লে-। এমতাবস্থায় ফরাসীরা ব্রিটিশদের হারিয়ে মাদ্রাজ দখল করে এবং ব্রিটিশদের সাহায্যের জন্য কর্ণাটকের নবাব আনোয়ারউদ্দিনের নিকট আবেদন জানায়। কিন্তু ১৭৪৪ সালে সেন্ট থোম-এর যুদ্ধে (দ্র ফরাসী বাহিনীর নিকট নবাব বাহিনী পরাজিত হয়।

প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ পাশ্চাত্যে সামরিক শক্তি(র শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ইউরোপীয় বাহিনীগুলির নিকট সংখ্যাবহুল অদ(ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপদার্থতা প্রতীয়মান হয়। প্রথম ইঙ্গ ফরাসী দ্বন্দ্বের পরিনতিতে ফরাসীরা ভারতের বুকে একটি প্রাদেশিক ও নৌ শক্তি(রূপে মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়। ১৭৪৮ খ্রীঃ আই-লা-স্যাপল সন্ধি স্বা(রিত হলে ইউরোপে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধির শর্তানুসারে ভারতেও ইঙ্গ -ফরাসী দ্বন্দ্বের সাময়িক বিরাম ঘটে।

তবে ব্রিটিশ ও ফরাসীদের পারস্পরিক বিরোধিতার অবসান হয় নি এবং দুপ্লে- ইংরেজদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি(স্বা(র করার ব্যাপারে নারাজ ছিলেন। কিন্তু ফরাসী সরকারের নির্দেশে তিনি তা করতে বাধ্য হন। বাণিজ্য ও বাণিজ্য কেন্দ্রকে ঘিরে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রা ছড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায় ফরাসীরা ইংরেজদের সঙ্গে আর একটি সংঘাতে যেতে উন্মুক্ত(হয়ে ওঠে। হায়দ্রাবাদ ও কর্ণাটকের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে এই সুযোগ তাদের কাছে আসে। বস্তুত কর্ণাটকের চাঁদা সাহেব নবাব আনোয়ারউদ্দিনের বিরদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন ও অন্যদিকে হায়দ্রাবাদে সিংহাসনের দাবীকে কেন্দ্র করে নাসির জঙ্গ ও মুজাফ্ফর জঙ্গের মধ্যে লড়াই বেঁধেছিল। ডুপ্লে- কর্ণাটকের চাঁদা সাহেব ও হায়দ্রাবাদের মুজফ্ফর জঙ্গকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেন। এবং তিনি তাঁর এই পরিকল্পনায় সাফল্যও লাভ করেন। এর বিনিময়ে ফরাসীরা সং(-ষ্ট ব্যক্তি(দের নিকট থেকে পন্ডিচেরী সংলগ্ন ৮০টি গ্রাম ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভ করে।

দা(ণাত্যে ফরাসী শক্তি(র দ্রুত বিস্তার ইংরেজদের শঙ্কার কারণ হয়। তারা মৃত আনোয়ারউদ্দিনের পুত্র মহঃ আলি যিনি ত্রিচিনোপল্লীতে ফরাসী কর্তৃক অব(দ্ধ হয়েছিলেন তাকে সাহায্য করতে উদ্যত হয়। এর পাশাপাশি নাসির জঙ্গকে ব্রিটিশরা সমর্থন দান করেন। আর এইভাবে কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদের উত্তরাধিকারী নির্ধারণের যুদ্ধে তারা লিপ্ত হয়। এই সময় কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ব্রিটিশ ও ফরাসীরা যেভাবে হস্ত(েপ করেছিল তা নজিরবিহীন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে জন্ম হয় দ্বিতীয় ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ(১৭৪৯) এবং রবার্ট ক্লাইভ ইংরেজদের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেন কর্ণাটকের রাজধানী আর্কট আত্র(মণের, যা ছিল ফরাসীদের একটি অন্যতম ঘাঁটি। ক্লাইভের এই সামরিকনীতি ব্রিটিশদের সাফল্য জয়যুক্ত(করে এবং ফরাসীবাহিনী ত্রিচিনোপল্লীতে অন্যত্র ত্র(মাগত ব্রিটিশদের হাতে পরাজিত হতে থাকে। চাঁদাসাহেব ধৃত হন ও তাকে হত্যা করা হয়। এই অবস্থায় ফরাসী কর্তৃপ(ইংরেজদের সঙ্গে সমঝোতা করার প্রয়োজন অনুভব করে এবং ১৭৫৪ খ্রীঃ দ্বিতীয় ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অবসান হয়। ইংরেজদের চাপে ফরাসী সরকার ডুপ্লে-কে প্যারিসে ফিরে আসতে নির্দেশ দেয় এবং ভারতের জন্য এক নতুন গভর্নর নিয়োগ করে।

১৭৫৬ খ্রীঃ ইউরোপে পুনরায় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ শু(হয় যার পরিনতিতে ১৭৫৮ খ্রীঃ পুনরায় ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের শু(হয়। এই সময় পলাশীর যুদ্ধে জয়ী ব্রিটিশদের আত্মবিশ্বাস ছিল তুঙ্গে, অন্যদিকে ফরাসীদের জয়লাভের আশা ছিল খুবই কম। এই যুদ্ধে ব্রিটিশরা মুর্শিদাবাদ থেকে প্রেরিত রসদের উপর নির্ভর করে জোরকদমে লড়াই চালায়, আর ফরাসীরা কাউন্ট ডি লালির নের্তৃত্বে শেষ চেষ্টা চালাতে থাকে। তারা বারংবার ইংরেজদের হাতে

পরাজিত হয় আর এই যুদ্ধের রেশ ধরে বঙ্গদেশে ফরাসীদের বাণিজ্য ঘাঁটি চন্দননগর দখল করে। সর্বোপরি ইংরেজ সেনাপতি আয়ারকূট বন্দীবাসের যুদ্ধে (১৭৬০) ফরাসীদের চূড়ান্তরূপে পরাজিত করে ও তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। ইতিমধ্যে ইউরোপে প্যারিসের সন্ধি নিয়ে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধেব অবসান হয়। এই সময় ব্রিটিশদের দ্বন্দ্বের অবসান হয়। এই সময় তাদের ছত্রছায়ায় ফরাসীদের বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়। তারা এদেশে তাদের ঘাঁটিগুলি বজায় রাখতে পারে এই শর্তে যে আর কখনো দুর্গ নির্মাণ বা সৈন্য সঞ্চয়ে উদ্যোগ নেবে না। ভারতের রাজনৈতিক কার্যকলাপে হস্তে(প না করার ব্যাপারে ফরাসীরা রাজী হয় আর এই মর্মে ভারতে ফরাসীর সাম্রাজ্য স্বপ্ন চিরতরে লোপ পায়। ইংরেজদের সার্বভৌমত্ব লাভের পথে আর কোনো বাধা থাকে না।

ভারতে ফরাসীদের ব্যর্থতার জন্য কতগুলি কারণ দায়ী ছিল, **প্রথমতঃ,** ইংরেজরা ফরাসীদের তুলনায় সম্পদ, আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহে অনেকগুণ এগিয়ে ছিল। শিল্পবিপ-বের পরিণতিতে ইংল্যান্ড ও ইংরেজ ব্যবসায়ীরা তখন ভারতের বুকে নিজেদের জায়গা করে নিতে বদ্ধপরিকর ছিল। তারা ভারতকে তাদের কাঁচামাল সরবরাহ এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিত্রীর (ে ত্ররূপে দেখেছিল। **দ্বিতীয়তঃ,** ফরাসী কোম্পানীর কিছু আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এদেশে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিপন্থী ছিল। বস্তুত অর্থের ব্যাপারে ফরাসী কোম্পানী ফরাসী সরকারের উপর অর্থনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। এককভাবে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেবার পরিবর্তে ফরাসী কোম্পানীকে সর্বদা প্যারিসের মুখাপে(ী হয়ে চলতে হত। **তৃতীয়তঃ,** নেতৃত্বজনিত সমস্যাও ভারতে ফরাসী ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল। ডুপে-কে বাদ দিলে ফ্রান্সের তরফে সেরকম কোনো দ(সেনাপতির আবির্ভাব ঘটে নি। আয়ারকোর্ট ও ক্লাইভের ন্যায় সেনানীরা ফরাসী সেনাধ্য(দের থেকে কয়েক ধাপ এগিয়েছিলেন। তাছাড়া তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ববিবাদও ভারতে ফরাসীদের অবস্থানকে দুর্বল করে তুলেছিল। সর্বোপরি পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মুর্শিদাবাদের রাজকোষের এক বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংরজেদের হস্তগত হয়। ফলে তারা ফরাসী অপে(া সম্পদে যথেষ্ট বলীয়ান ছিল। এর পাশাপাশি তাদের গগনচুম্বী আত্মবিশ্বাস ও ফরাসীদের পতন ত্বরান্বিত করে।

৩.১ ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক

১৭৬০-'৯৯র মধ্যে যেরূপে ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক বর্ধিত হয়েছিল তাকে বুঝতে গেলে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার। যথা— হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের ফরাসী প্রীতি, আর্কট, হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মারাঠাদের পারস্পরিক শত্রুতা, একটি ভারতীয় শক্তি(কে অপর ভারতীয় শক্তি(র বি(দ্ধে সমর্থন যোগাবার ব্রিটিশ নীতি, বিশ্বব্যাপী ইংরেজ ও ফরাসীদের শত্রুতা, সর্বোপরি মহীশূরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ব্রিটিশ প্রয়াস।

হায়দার আলী ছিলেন একজন উচ্চভিলাষী সেনানী, যার জন্ম হয় খুব সাধারণ পরিবারে। তিনি মহীশূরের হিন্দু রাজাকে (মতাচ্যুত করেন এবং নিজেকে মহীশূরের স্বাধীন নবাব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। দা(িণাত্যে যে রাজনৈতিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল যার উৎস ছিল ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হায়দারকে তার শক্তি(সংহত করার সুযোগ দিয়েছিল। দা(িণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলাকালে হায়দার ফরাসীদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হন। এবং এইভাবে ইংরেজদের নজরে পড়েন। মহীশূরের সামরিক নৈপুণ্য ও ফরাসী প্রীতিতে ব্রিটিশরা শঙ্কিত হয়, যার মধ্যে নিহিত ছিল ইঙ্গ-মহীশূর দ্বন্দ্বের বীজ। সামরিক শক্তি(হিসাবে মহীশূরের চমকপ্রদ উত্থান ইংরেজদের সার্বভৌমত্বের পথে অন্তরায় রূপে গণ্য হয়।

হায়দ্রাবাদের নিজাম, আর্কটের নবাব এবং মারাঠারাও হায়দারের রাজনৈতিক (মতাবৃদ্ধিতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ইংরেজরা এই ত্রয়ীর আতাতে যোগ দেয় এবং মহীশূরের বি(দ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এর পরিণতিতে ১৭৬৭-

৬৯ খ্রী-র মধ্যে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ঘটে। যদিও হায়দার নির(র ছিলেন। কিন্তু তার সামরিক পারদর্শিতা ছিল তুলনাতীত, যা মহীশূরের প(লাভজনক রূপে বিবেচিত হয়েছিল। মাদ্রাজের সন্ধি দ্বারা প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান হয় ও এই সন্ধির বেশীরভাগ শর্তই হায়দারের প(গিয়েছিল। এর ফলে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রয়াস নেওয়া হয় অপরের স্বার্থ বিঘ্নিত না করে। এই সন্ধির একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিল এই যে, যদি সন্ধি স্বা(রকারী উভয়প(র কোনো প(তৃতীয় প(র সামরিক আগ্রাসনের সম্মুখীন হয় তাহলে তাকে সাহায্য করতে সন্ধির অপর প(-ও এগিয়ে আসবে এবং সেই তৃতীয় প(তাদের সাধারণ শত্রুতে পরিণত হবে। প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পরিণতিতে, বিশেষত মাদ্রাজের সন্ধি স্বা(রিত হলে (১৭৬৯) ভারতে ব্রিটিশদের মর্যাদা হানি হয় ও এই যুদ্ধের তাৎপর্য এই যে ব্রিটিশরা সাময়িকভাবে হলেও হঠতে বাধ্য হয়। ফলে হায়দারের সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং ইঙ্গ মহীশূর দ্বন্দ্বের ভবিষ্যৎ ধারাবাহিকতা প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ এর এক দশক পরে ১৭৮০ খ্রীঃ শু(হয়। ১৭৭১ খ্রীঃ মারাঠারা যখন মহীশূর আত্র(মণ করে তখন হায়দারের আবেদনে ইংরেজরা সাড়া দেয় নি। ইংরেজদের এই বি(্বাসঘাতকতা হায়দারকে ব্যথিত করে। কারণ মাদ্রাজের সন্ধি অনুযায়ী তাদের উচিৎ ছিল মারাঠা আত্র(মণকালে মহীশূরকে সাহায্য দান করা। এই সময় হায়দার সাময়িকভাবে হলেও নিজাম ও মারাঠাদের তাঁর প(আনতে সমর্থ হন। এদের সম্মিলিত শক্তি(দঃ ভারতে ব্রিটিশ শক্তি(কে একের পর এক যুদ্ধে পরাস্ত করতে থাকে। তার শক্তি(র প্রধান উৎস ছিল অ(ারোহী বাহিনী ও মোটামুটি গেরিলা ধরণের যুদ্ধ পদ্ধতি। হায়দার কর্ণাটকের প্রায় পুরোটই তার দখলে আনতে সমর্থ হন। তবে ১৭৮২ খ্রীঃ ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে সানবাইয়ের সন্ধি স্বা(রিত হলে স্রোত অন্য খাতে বইতে শু(করে। মারাঠাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি(র পরিণতিতে ব্রিটিশরা মহীশূরের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দানে সমর্থ হয়। এর পাশাপাশি দেশীয় শক্তি(গুলির সম্মিলিত বাহিনীর হাত থেকেও তারা রেহাই পায়। নিজামকে গুন্টুর জেলা দান করে ওয়ারেন হেস্টিংস তাকে নিরপে(রাখেন। ১৭৮১-র জুলাইতে ইংরেজ সেনাপতি আয়ারকূট হায়দারকে পোর্ট নোভার যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং মাদ্রাজ অধিকারে সমর্থ হন। ১৭৮২ খ্রীঃ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সময় হায়দার মৃত্যু বরণ করেন।

হায়দারের মৃত্যু বা পোর্টনোভার যুদ্ধে পরাজয় মহীশূরের শক্তি(কে খর্ব করতে পারে নি। হায়দারের পর তাঁর পুত্র টিপু মহীশূরের নবাব হন। বিদানুরের এবং অন্যত্র ইংরাজ শক্তি(তার নিকট পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে দুটি প(ই ছিল দুর্দমনীয়। ইতিমধ্যে ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অবসান হলে মাদ্রাজে ইংরাজ সরকারও যুদ্ধস্বরূপ কোনো আর্থিক (তির সঙ্গে আর নিজেকে জড়াতে চায় নি। মাদ্রাজের লর্ড ম্যাকার্টনে (Macartney) এই সময় মহীশূরের সঙ্গে শান্তিচুক্তি(সা(রে উদ্যত হল ও ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি স্বা(রিত হয়। এই সন্ধির পরিণতিতে টিপু তাঁর রাজ্য ও সামরিক শক্তি(অ(ণ্ণ রাখতে সমর্থ হন। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর প(যে তখন টিপুকে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে বিচার করলে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি ছিল তাঁর রাজনৈতিক সাফল্যের শীর্ষবিন্দু। তবে এই সন্ধির মেয়াদ ছিল সীমিত এবং পুনরায় ইঙ্গ-মহীশূর দ্বন্দ্বের (ত্র প্রস্তুত হয়।

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি ইংরেজদের হতাশ করে। তারা দঃ ভারতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের পথে টিপুকে প্রধান শত্রুরূপে দেখে। অন্যদিকে টিপু ভারত থেকে ব্রিটিশকে উচ্ছেদ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিলেন এবং তাঁর পিতার অসমাপ্ত কর্মযজ্ঞের ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন। ইংরেজরদের পুরনো মিত্র ত্রিবাঙ্গুরের রাজাকে যখন টিপু আত্র(মণ করেন তখন তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই সময় ব্রিটিশরা হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মারাঠাদের নিজপ(আনতে সমর্থ হয়।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতীয় শক্তি(গুলিকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের ব্রিটিশ কূটনৈতিক প্রয়াসের সার্থকতা পুনরায় প্রতিফলিত হয়। এইরূপ প্রত্রি(য়ায় ইংরেজরা হায়দ্রাবাদের নিজাম

ও মারাঠাদের থেকে টিপুকে বিচ্যুত করে তাঁর উপর ত্র(মাগত সামরিক চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। টিপুর সঙ্গে তাদের যে তৃতীয় লড়াই হয়, তাতে 'মহীশূরের বাঘের' বি(দ্ধে কর্ণওয়ালিশ নিজে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নেন এবং শ্রীরঙ্গ পত্তমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, যা ছিল টিপুর রাজধানী। টিপু যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে ব্রিটিশ, মারাঠা ও নিজামের এই সম্মিলিত আত্র(মণ প্রতিরোধ করতে পারবেন না। তাই তিনি সমঝোতার সিদ্ধান্ত নেন ও ১৯৭২ খ্রীঃ শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি স্বা(র করেন ইংরেজদের সঙ্গে। এই সন্ধির শর্তগুলি টিপুর জন্য চরম অবমাননা বহন করে আনে। তিনি তাঁর অর্ধেক রাজ্যাংশ ব্রিটিশদের সমর্পন করেন ও যুদ্ধের (তিপূরণ বাবদ ৩৩০ ল(টাকা প্রদান করেন। এছাড়া তাঁকে বাধ্য করা হয় তাঁর দুই পুত্রকে ইংরেজদের নিকট জামিন রাখার জন্য। এই সন্ধির পরিনতিতে দঃ ভারতে মহীশূরীয় আধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন চিরতরে অস্তমিত হয়।

১৭৯৮ খ্রীঃ লর্ড ওয়েলেসলী ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন এবং ব্রিটিশদের সম্প্রসারণ নীতি এক নতুন মাত্রা পায়। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি যেসব শক্তি(আনুগত্য প্রদর্শন করেনি তাদের প্রতি তিনি কড়া মনোভাব নেন, মহীশূরও এর থেকে বাদ যায়নি। তবে টিপু এই সময় নিশ্চি(য় হয়ে বসেছিলেন না ও শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধিকে তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। আর টিপুকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো ভারতীয় শক্তি(ও তখন ব্রিটিশ বিরোধীতার পথ বেছে নেয়নি। এমতাবস্থায় টিপু সাহায্যের জন্য বর্হিভারতের দিকে দৃষ্টিনি(প করেন এবং বিপ্ল-বী ফ্রান্সের সঙ্গে তার সমঝোতা হয়। মরিশাসের শাসন কর্তার সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। এছাড়া তিনি তুরস্ক ও আফগানিস্তানে দূত প্রেরণ করেন। তবে তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী অভিযানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় শেষমেধ্য, তদুপরি এই সময় পৃথিবীব্যাপী ইঙ্গ-ব্রিটিশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রে(তে ব্রিটিশরা টিপুর ফরাসী প্রীতি ভালোচোখে দেখেনি। এরূপ পরিস্থিতিতে টিপুকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা ব্রিটিশদের অন্যতম ল(্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা ভারতে পুনরায় ফরাসী শক্তি(র পুনঃ অভ্যুত্থানের পথও (খে দিতে চেয়েছিল। ফলতঃ ১৭৯৯ খ্রীঃ ব্রিটিশরা শ্রীরঙ্গপত্তম আত্র(মণ করে।

লর্ড ওয়েলেসলী টিপুকে অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে টিপু তা প্রত্যাখ্যান করেন, ফলে যুদ্ধ এড়ানো তার প(সম্ভব হয়নি। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে ভারতীয় রাজাদের আনুগত্যের বিনিময়ে তাদের ব্রিটিশ সামরিক নিরাপত্তাদানের কথা বলা হয়েছিল। টিপু অন্য ধাতুতে গড়া ছিলেন। তিনি পরাধীনতা অপে(া সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণকেই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধ সং(প্ত হলেও তার ব্যাপকতাকে অস্বীকার করা যায় না। ফরাসী সামরিক সাহায্য লাভের পূর্বেই টিপুকে শ্রীরঙ্গপত্তম হারাতে হয়। এবং মহীশূরের ব্যঘ্রচিত বীর নায়ক টিপু ১৭৯৯ খ্রীঃ অসম সাহসীকতার সঙ্গে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেন।

টিপুর রাজ্যের প্রায় অর্ধাংশ ব্রিটিশ ও হায়দ্রাবাদের নিজাম নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় এবং হায়দার যে হিন্দু রাজাকে (মতাচ্যুত করেছিলেন তার বংশধর মহীশূর রাজ্যের খুব সামান্য অংশে নিজের শাসন কায়েম করল, যার সঙ্গে ইংরেজদের মিত্রতা নীতি স্বা(রিত হয়। মহীশূরের পতন ফরাসীদের মস্তকোত্তলনের সম্ভাবনা চিরতরে নিবষ্ট করে ও ব্রিটিশরা ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে, যাদের চ্যালেঞ্জ জানানোর (মতা দেশী বিদেশী কোনো শক্তি(রই তখন ছিল না।

৩.২ মহীশূরের পতনের কারণ

কিছু লেখকের মতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দেবার ব্যাপারে টিপু সুলতানের অযোগ্যতাই মহীশূরকে পতনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর পিতা হায়দারের ন্যায় পারদর্শী ছিলেন না। তবে এই বক্ত(ব্যের সত্যতা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নেওয়া যায় না। হায়দারের সময় ভারত ও বর্হিভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি গুণগত

রূপান্তর ঘটেছিল। হায়দার তাঁর আমলে চলাকালীন ইঙ্গ-ফরাসী ও দ(ি ণ ভারতে ইঙ্গ-মারাঠা সামরিক দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু টিপু সুলতানের আমলে ব্রিটিশরা মারাঠাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে এবং পুরোপুরি তাঁকে গমনের ব্যাপারে নজর দেয়। আর টিপু যখন নবাব হন তখন ফরাসীদের ইংরেজরা ভারত থেকে বিতাড়িত করেছে। **দ্বিতীয়তঃ,** টিপুর ব্রিটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্র সফল হয়নি, যেখানে হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মারাঠারা ব্রিটিশ ছত্রছায়ায় টিপুর বি(দ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল সেখানে তিনি ব্রিটিশদের বি(দ্ধে একক সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হন। **তৃতীয়তঃ,** ব্রিটিশদের কূটনৈতিক চালে ভারতীয় শক্তি(গুলি তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। মহীশূরের পতনের একটি অন্যতম কারণ হল টিপুর বি(দ্ধে নিজাম ও মারাঠাদের যোগদান, আর এইভাবে ব্রিটিশ, মারাঠা ও হায়দ্রাবাদের নিজামের সম্মিলিত শক্তি(টিপুকে (মতাচ্যুত করে মহীশূরের পতনকে ত্বরান্বিত করে। **চতুর্থতঃ,** ব্রিটিশরা বিভিন্ন দেশীয় শক্তি(র সাহায্য লাভ করলেও টিপুর ফরাসী সাহায্য লাভের আকাঙ(া বাস্তবায়িত হয়নি। টিপু একাই ব্রিটিশদের বি(দ্ধে লড়েন। **পঞ্চমত,** ১৭৯০ এর দশকে ব্রিটিশ (মতা তার শিখরে পৌঁছেছিল। যুদ্ধে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ তথা রসদের ব্যাপারে ব্রিটিশ শিবিরে কোনো ঘাটতি ছিল না। তারা উন্নত ধরণের আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানত। হায়দার আলি অ(ারোহী বাহিনীর উপর নির্ভর করে গেরিলা পদ্ধতিতে ইংরেজদের বি(দ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। অন্যদিকে টিপু তার গোলন্দাজ বাহিনীর উপর ভরসা করেন, যারা সরাসরি ব্রিটিশদের আত্র(মণের নীতি নেয়। এ(ত্রে টিপুর সৈনিকরা যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রের ব্যাপারে ইংরেজেদের অপে(া যথেষ্ট কম সুদ(ছিল। সর্বোপরি মহীশূরের পতন অনিবার্য ছিল। টিপু ইতিহাসের গতি পাল্টাতে পারতেন না। ইতিহাসের অমোঘ নিয়ামানুযায়ী টিপুর মতন লঘু হৃদয় ব্যক্তি(কেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের নিকট হার মানতে হয়েছিল। এই সময় প্রায় সকল ভারতীয় রাজাই ব্রিটিশদের পদানত হয়েছিল। একা টিপুর প(কোনোমতেই নিজের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না।

৩.৩ ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক

আহম্মদ শাহ আবদালী একটি নতুন আফগান সাম্রাজ্য স্থাপনের ন্যায় শক্তি(শালী ছিলেন না। কিন্তু পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) তিনি মারাঠাদের যেভাবে পরাজিত করেন তার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের পর ভারতের বুকে কোনো দেশীয় স্থাপনের স্বপ্ন চিরতরে অস্তমিত হয়। এই যুদ্ধের পর মারাঠাদের সামরিক শক্তি(ভেঙে পড়ে এবং ব্রিটিশরা মারাঠা ও দঃ ভারতে তাদের আধিপত্য কায়েমের সুযোগ পায়। জনৈক ঐতিহাসিক যথার্থই বলেছেন যে 'প্রকৃতপ(পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এটা স্থির করেনি যে ভারতের বুকে কে রাজত্ব করবে বা ভারতের বুকে কার রাজত্ব করার সামর্থ আছে। তবে তা ভারতে ব্রিটিশ উত্থানের পথ প্রশস্ত করে দেয়।' তবে মারাঠারা পানিপথের যুদ্ধে তাদের যে (তি হয়েছিল তা দ্রুত পূরণে সমর্থ হয় ও ভারতীয় উপমহাদেশের বুকে কে তাদের আধিপত্য কায়েম করবে এ নিয়ে ব্রিটিশ ও মারাঠাদের দ্বন্দ্ব শু(হয়। বিভিন্ন দেশীয় শক্তি(কে একে অপরের বি(দ্ধে ব্যবহারের যে নীতি ব্রিটিশরা নিয়েছিল তার পরিণতিতে তারা বাংলার বুকে জাকিয়ে বসে। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শু(হয় তখনই যখন মারাঠাদের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে ব্রিটিশরা হস্ত(প করে।

এই সময় একদিকে রঘুনাথ রাও ও অন্যদিকে পুনদেরকার প্রতিপত্তিশালী নেতৃবর্গ যারা দ্বিতীয় মহাদেব রাও-এর প(ছিলেন, এই উভয় দলের মধ্যে পেশোয়া পদের উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব শু(হয়। রঘুনাথ রাও তার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় মহাদেবরাওকে সরানোর জন্য বম্বেস্থিত ব্রিটিশদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। ইংরেজরা এতে সানন্দে সাড়া দেয় ও ১৭৭৫ খ্রীঃ সুরাটের সন্ধি সা(র হয়। আর এভাবেই ইংরেজরা প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে (১৭৭৫)। বস্তুত সুরাটের সন্ধি কলকাতাস্থিত ইংরেজ কর্তৃপ(মেনে নেয়নি, যারা রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে উচ্চতর

মর্যাদা ভোগ করে থাকে। কলিকাতা কাউন্সিল মারাঠাদের সঙ্গে পুরন্দরের সন্ধি স্বা(র করেছিল। তার ফলে সুরাটের সন্ধিকে স্বীকৃতি দিতে তারা ইচ্ছুক ছিল না। পুরন্দরের সন্ধির পরিনতিতে দ্বিতীয় মহাদেব রাওকে আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, আর এই সন্ধির নেপথ্যে ছিল ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সর্ব্বোচ্চ কর্তৃপ(কোর্ট অফ ডিরেকটরস। যখন সুরাটের সন্ধিকে বৈধ বলে গ্রহণ করা হল তখন ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে যুদ্ধ লাগল। এই যুদ্ধ চলে ৭ বছর ও ১৭৮২ তে সলবাই এর সন্ধি সা(রিত হলে যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ চলাকালে সকল মারাঠা প্রধান তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল পেশোয়া ও তার প্রধানমন্ত্রী নানা ফড়নবীশের প্রতি। এই সময়টা ব্রিটিশদের প(তেমন ভালো ছিল না। কারণ তাদের তখন মারাঠা, মহীশূর ও হায়দ্রাবাদের সম্মিলিত শক্তি(র মুখোমুখি হতে হয়েছিল। প্রথমে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে দুই প(ই অবিজিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সলবাইয়ের সন্ধির তাৎপর্য সং(পে বি(-ষণ করলে এই দাঁড়ায় যে— (১) এই সময় ব্রিটিশদের সঙ্গে মারাঠাদের ২০ বছরের জন্য শান্তি স্থাপিত হয়, যার ফলে ব্রিটিশরা তাদের (মতা সংহত করার সুযোগ পায়। (২) এই যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা মহীশূরের বি(দ্ধে তাদের পূর্ণ শক্তি(নিয়োগ করতে সমর্থ হয়। (৩) কিছুটা হলেও মারাঠাদের হৃত সামরিক গৌরব উদ্ধার করা সম্ভব হয় ও তাদের চরম বিপর্যয় কুড়ি বছর পিছিয়ে যায়। এই কুড়ি বছরব্যাপী ইংরেজরা যখন তাদের (মতা বিস্তারে মন দিয়েছিল তখন মারাঠারা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিবাদে মগ্ন ছিল। সেদিক থেকে, অনেকের মতে, সলবাইয়ের সন্ধি একটি অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধোচিত সন্ধি।

সলবাইয়ের সন্ধির পরবর্তী দুই যুগকে মারাঠা ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগ বলে চিহ্নি(ত করা যায়। এই সময় অন্যতম মারাঠা নেতা মহাদজী সিন্ধিয়া ফরাসী কর্মচারীদের সহায়তায় একটি শক্তি(শালী সামরিক বাহিনী গড়ার কাজে মন দেয়। তাঁর প্রতিভা ছিল তুলনাতীত। কিন্তু তিনি তাঁর বেশীরভাগ সময় ব্যয় করেছিলেন নানা ফড়নবীশের বি(দ্ধে ষড়যন্ত্রে। ইন্দোরের হোলকার তাঁর শত্রু ছিল। ১৭৯৪ তে সিন্ধিয়ার মৃত্যু ও ১৮০০ খ্রীঃ নানা ফড়নবীশের মৃত্যু হলে মারাঠাদের সামগ্রিক বিপর্যয় ত্বরান্বিত হয়। এই সময় কোনো শক্তি(শালী মারাঠা নেতাকে আবির্ভূত হতে দেখা যায়নি ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। মারাঠা নেতাদের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশরা মারাঠা নেতাদের দুদলে ভাগ করে কোনো মাধবরাও এরপর যখন পেশোয়া পদে দ্বিতীয় বাজীরাও অভিব্যক্ত(হন তখন মারাঠাদের দুর্বলতা প্রকটিত হয় এবং শাসনকর্তা হিসাবে মাধবরাও ছিলেন যথেষ্ট অযোগ্য। ফলতঃ তিনি চাপে পড়ে অধীনতামূলক মিত্রতার মাধ্যমে ব্রিটিশদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে বাধ্য হন। এর পূর্বেও ইংরেজরা বারংবার অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণের জন্য মারাঠাদের চাপ দিয়েছে, কিন্তু বিচ(ণ নানা ফড়নবীশ সেই ফাঁদে পা দিয়েছেন, তবে ১৮০২ তে যখন পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার সম্মিলিত বাহিনী হোলকারের কাছে পরাজিত হয় ও ব্যক্তি(গত সামর্থ র(ার স্বার্থে দ্বিতীয় বাজীরাও ব্রিটিশদের নিকট আত্মসমর্পন করে, তখন পূর্বের মারাঠা গৌরব প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছিল। বেসিনের সন্ধি (১৮০২) দ্বারা ইংরেজরা তাঁর সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির শর্তানুসারে বাজীরাও-এর রাজ্যাংশে ঠাই পায়।

ব্রিটিশরা ভেবেছিল বেসিনের সন্ধি মারাঠা শক্তি(র মে(দণ্ড ভেঙে দেবে এবং মারাঠা প্রধানরা আত্মসমর্পন করবে। তবে মারাঠা প্রধানরা অত সহজে হার মানতে রাজী ছিলেন না এবং তাদের এই অদম্য মনোবলই দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূচনা করে। তবে এই বিপদের সময়েও মারাঠারা সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করেনি। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সম্মিলিত বাহিনী আসাই, আরগন ও লাসোয়ারীর যুদ্ধে ১৮০৩ খ্রীঃ ইংরেজদের নিকট পরাজিত হয়, ফলে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে কেউই আর পুনর্বার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি এবং তারা ব্রিটিশদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ হয়। যখন ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া ব্রিটিশদের বি(দ্ধে লড়ছেন তখন হোলকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল আর গাইকোয়াড় নিজের জাত ভাইদের নয়, বরং বিদেশীদের সাহায্যদানে অগ্রণী হয়।

যখন ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া ব্রিটিশদের কাছে হার মেনে নিয়েছেন তখন হোলকার ব্রিটিশ বিরোধিতার পথ অবলম্বন করে। একস্থান থেকে অপর স্থানে দ্রুত গমনশীল মারাঠা বাহিনীর পুরনো ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে হোলকার ব্রিটিশদের সাময়িক ত্রাসে পরিণত হন। তবে ব্রিটিশরা হোলকারের মিত্র ভরতপুরের রাজাকে পরাস্ত করতে সমর্থ হয়। তবুও হোলকার সাফল্য সহকারে ব্রিটিশদের বি(দ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। তবে এই সময় লর্ড ওয়েলেসলীর আগ্রাসন নীতি নিয়ে পুনর্বার ভাববার অবকাশ দেখা দেয়, কেননা ব্রিটিশদের বিভিন্ন সামরিক অভিযানের পরিনতিতে তাদের অর্থ টান পড়েছিল। তৎকালে ইউরোপে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল তার বলে লন্ডনের ইংরেজ কর্তৃপ(দেশীয় শক্তি(র উপর তাদের সামরিক বিজয় লাভের নীতি থেকে সরে আসে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নেপোলিয়নের (মতা লাভও ইউরোপীয় পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিবর্তনে দায়ী ছিল। এমতাবস্থায় ওয়েলেসলীকে ইংল্যান্ডে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্রিটিশরা হোলকারের সঙ্গে সমঝোতা ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হয়।

বারংবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পরিণতিতে মারাঠা নেতাদের সামরিক (মতা পূর্বাপে(া হ্রাস পায়। তবে তবুও স্বশাসন কায়েম রাখার অভিল(ছিল অটুট। তাদের এরূপ চরম বিপর্যয়ের কালে ইংরেজদের সঙ্গে সমঝোতা, অর্থাৎ অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। আর এই মিত্রতার অধীনে তাদের যেরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল তবে তারা পুনরায় মস্তকোত্তলনের প্রয়াস নেয়। আর এদিকে ব্রিটিশরা পুনাদরবারের নানা কার্যকলাপে অনধিকার হস্ত(প করেছিল যা অধীনতামূলক মিত্রতার বিপরীত ছিল। দ্বিতীয় বাজীরাও প্রায়শই নানাভাবে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের কাছে নানাভাবে প্রশাসনিক ব্যাপারে অপমানিত হতেন এতে মারাঠাদের গৌরব লুণ্ঠিত করেছিল। ১৮৭১ তে পেশোয়ার নেতৃত্বে মারাঠা প্রধানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শেষ চেষ্টা চালায়, যার পরিণতিতে দেখা দেয় তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস এই যুদ্ধে ব্রিটিশদের তরফ থেকে সর্বান্তঃকরণে প্রয়াস নিয়েছিলেন এবং বারংবার পেশোয়া, হোলকার ও সিন্ধিয়া ব্রিটিশদের হাতে পরাজয় বরণ করেন। পেশোয়াকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়, তার রাজ্য দখল করা হয় ও তাকে একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বন্দী জীবনযাপনে বাধ্য করা হয়। হোলকার, ভোঁসলে ও সিন্ধিয়ার কপালেও একই পরিণাম জোটে। মারাঠাদের আবেগ অনুভূতিতে যাতে উত্তরোত্তর আঘাত না লাগে তাই ব্রিটিশরা সাতারায় একটি রাজতন্ত্রের সূচনা করে যেখানে পুতুল শাসক হয়ে বসেন শিবাজীর উত্তরাধিকারীরা। ফলে দুর্ধর্ষ মারাঠা প্রধানরাও শেষ অব্দি ঔপনিবেশিক শাসনের বলী হন।

৩.৪ মারাঠাদের পতনের কারণ

মারাঠা শক্তি(কখনোই নিজেদেরকে মুঘল শাসনের বিকল্প হিসাবে তুলে ধরতে পারেনি। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর যে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণ করে ব্রিটিশ শক্তি(। ফলে মারাঠাদের সর্ব ভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন কল্পনাই থেকে যায়। শিবাজী ও প্রথম তিনজন পেশোয়ার আমলে মারাঠাদের অসাধারণ রাজনৈতিক সাফল্যের মূলে ছিল তাদের দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তি(। কিন্তু ব্রিটিশদের সঙ্গে মোকাবিলায় মারাঠারা পরাজিত হয় ও চিরতরে তাদের প্রাধান্য হারায়। নিম্নে তাদের পতনের কারণ অলোচিত হল—

প্রথমতঃ, মারাঠাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা মুঘলদের অপে(া কম ছিল না এবং মারাঠা সর্দাররা অনেকটাই পরবর্তীকালের মুঘল অভিজাতদের ন্যায় ছিলেন। শিবাজীর অধীনে যে শক্তি(শালী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিস্তার ঘটেছিল, তার ফলে মারাঠা নেতারা পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ নির্বিশেষে একত্রিত হয়েছিল। শিবাজীর পরে মারাঠা অর্থনীতিতে সামন্ততন্ত্রের যে প্রাধান্য দেখাদিয়ে ছিল তা রাজনৈতিক সামন্তীকরণের পথ মসৃণ করে দেয়। মারাঠা সর্দাররা কার্যত

স্বাধীন ছিলেন এবং তারা মারাঠা সাম্রাজ্যের এক্তি(য়ারের মধ্যে নিজ নিজ রাজ্য গড়ে তোলেন। এই সকল বিবাদমান স্বাধীনতা মারাঠা নেতৃবর্গ যেরূপ পরিস্থিতির জন্য দায়ী ছিলেন তার ফলে মারাঠা সাম্রাজ্য একটি শিথিল মিত্র সংঘে পরিণত হয়।

বস্তুত মারাঠাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উৎপাদনশীল ছিল না মারাঠারা প্রায়ই দস্যুবৃত্তি ও লুঠতরাজের মাধ্যমে অর্থনীতিকে চালু রাখার প্রয়াস নিত। তারা প্রতিবেশী রাজ্যগুলির অধিবাসীদের থেকে চৌথা নামে এক প্রকার কর নিত। পুরাকালীন রোমান সাম্রাজ্যের ন্যায় মারাঠারাও বাইরে থেকে আসা অর্থের যোগানের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল। কেননা তাদের অর্থনীতি ছিল অউৎপাদনশীল। এ ধরণের ব্যবস্থায় পতন অনিবার্য ছিল। আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই নেতিবাচক প্রভাব সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত করছিল।

তৃতীয়তঃ, মারাঠা মিত্রসঙেঘ প্রধান ছিলেন ৫ জন বড় মাপের মারাঠা নেতা(পুনাস্থিত পেশোয়া, বরোদার গাইকোয়াড়, ইন্দোরের হোলকার, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া ও নাগপুরের ভোঁসলে। তবে এরা কখনোই ব্রিটিশদের বি(দ্ধে কোনো সংহত প্রতিরোধ গড়তে পারেননি, বরং তারা আলাদা আলাদা ভাবে ব্রিটিশদের বি(দ্ধে লড়াই করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ যখন ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া ইংরেজদের বি(দ্ধে অস্ত্রধারণ করেন তখন হোলকার নীরব ছিলেন। আর ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া যখন ব্রিটিশদের হাতে পর্যুদস্ত তখন হোলকার ইংরেজদের বি(দ্ধে অস্ত্র ধরেন। বলাবাহুল্য এই একতার অভাবই মারাঠাদের পতন ত্বরান্বিত করেছিল।

চতুর্থতঃ, শিবাজীর সময় থেকে মারাঠাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভরশীল ছিল তাদের নেতৃবর্গের ব্যক্তি(গত গুণাবলীর উপর কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো উল্লেখযোগ্য নেতার আবির্ভাব হয় নি। মোটামুটি ১৮ শতকের শেষার্ধে সকল গু(ত্বপূর্ণ ও প্রতিভাধর নেতা, যথা— মহাদজী সিন্ধিয়া, তুকজী হোলকার, নানা ফড়নবীশ পরলোকগমন করেছিলেন। দ্বিতীয় বাজীরাও ছিলেন স্বার্থপর ও বি(্বাসের অযোগ্য। সুতরাং ডুবন্ত মারাঠা তরণীর হাল ধরার মত কোনো যোগ্য ব্যক্তি(ত্ব তখন অনুপস্থিত ছিল।

পঞ্চমতঃ, গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে ও অ(্বারোহী বাহিনীর ব্যবহারে মারাঠাদের যে পটুতা ছিল, যা ছিল তাদের ঐতিহ্যিক যুদ্ধনীতি স্বরূপ, তা তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের উৎসরূপে বিবেচিত হত। কিন্তু পরবর্তী মারাঠা নেতারা দেশীয় পদ্ধতি ছেড়ে রণ(ে ত্রের পাশ্চাত্য নীতির দিকে ঝোঁকেন ও তারা দেশী বিদেশী উভয় প্রকার যুদ্ধনীতির মধ্যে সাযুজ্য স্থাপনে ব্যর্থ হন। এর পদ্ধতিতে মারাঠা যুদ্ধনীতি আংশিক দেশী ও আংশিক বিদেশী থাকে, যার ফলে খুব একটা ইতিবাচক হয়নি। মারাঠারা যে ধরণের কামানের গোলা ব্যবহার করত তা ভারী ও সেকেলে ছিল, অন্যদিকে ব্রিটিশরা যে ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র ও কামানের গোলা ব্যবহার করত তা গুণগত দিক থেকে অনেক উন্নত ছিল।

সর্বোপরি নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মারাঠারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি ও মারাঠা নেতারা নিজেদের একটি সফল অর্থনীতির জনক হিসাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হন। খাল খনন ও জলাধার নির্মাণ করে জলসেচের সাহায্যে মহারাষ্ট্রের উষর জমিতেও ফসল ফলানো যেত। কিন্তু মারাঠা নেতারা বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি(র গু(ত্ব অনুধাবন করেনি ও ব্যবসা বাণিজ্য প্রসঙ্গে নি(ৎসাহ ছিলেন। তারা অতীতকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিলো। মহারাষ্ট্রের এই পশ্চাদপদ ও বন্ধ্যা চরিত্রই মারাঠা শাসকদের বাধ্য করেছিল আশপাশের রাজ্যগুলিতে লুঠপাট চালাতে। মারাঠা সামন্তরা যে সন্ত্রাসের শাসন কায়েম করেছিল তাতে জনগণ তাদের উপর (ুব্ধ হয় এবং এভাবে বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের পথও (দ্ধ হয়ে যায়। যদিও মারাঠা নেতারা তাদের রাষ্ট্রকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে পারতেন তবেই হয়ত ব্রিটিশদের সঙ্গে মোকাবিলায় জয়যুক্ত(হওয়া যেত।

৩.৫ রঞ্জিত সিংহের পরবর্তীকালীন ইঙ্গ-শিখ দ্বন্দ্ব

যদিও রঞ্জিত বিদেশী আত্র(মণের সম্ভাবনা সমূলে প্রতিহত করতে পারেননি, তবে তিনি পাঞ্জাবের জনতাকে একটি স্থায়ী ও শক্তি(শালী প্রশাসন দান করেছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ রঞ্জিত সিংহের মৃত্যু হলে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অনিরাপত্তার ফরে অবতীর্ণ হয়। রঞ্জিতের উত্তরাধিকারীরা ছিলেন দুর্বল, ফলে স্বার্থলোভী নেতারা ইতিহাসের পাদপ্রদীপে আসার সুযোগ পায়। পাঞ্জাবের রাজদরবারে শিখ নেতারা নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করণের যে খেলায় মেতে ওঠেন তার ফলে এক অপরিসীম রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতাপূরণ করে দেশপ্রেমী পাঞ্জাবী সামরিক বাহিনী যারা যাবতীয় (মতা করায়ত্ত করতে সমর্থ হয়। এই বাহিনী সাহসী ও ঋজু হলেও বিশৃঙ্খল ছিল। আর এই আভ্যন্তরীণ ও রাজনৈতিক চাপান-উতোরের সুযোগটা গ্রহণের অপে(ায় ব্রিটিশরা দিন গুনতে থাকে। তারা রঞ্জিত সিংহের সময় থেকে শতদ্রুর পশ্চিম তীরস্থ রাজ্যগুলির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নি(প করেছিল এবং এখন তা পরিপূরণের সুযোগ আসে।

কয়েকটি কারণের জন্য ইংরেজ ও শিখদের মধ্যে লড়াই অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৮৪৪ খ্রীঃ পাঞ্জাবে ব্রিটিশ এজেন্টরূপে মেজর ব্রডফুট মনোনীত হন যিনি শিখদের সম্পর্কে যথেষ্ট সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন। মেজর, শিখ সর্দার ও সামরিক কর্মচারীদের বারংবার অপমান করে খালসা বাহিনীকে উত্তেজিত করে তোলেন। **দ্বিতীয়তঃ,** শতদ্রু নদীর ওপর সেতু নির্মাণের জন্য ব্রিটিশরা পাঞ্জাব সীমান্তে বাড়তি ফৌজ পাঠাতে থাকে। ব্রিটিশ বাহিনীর এহেন সংখ্যা বৃদ্ধি শিখ সামরিক বাহিনীকে শঙ্কিত করে তোলে এবং তারা ব্রিটিশ আত্র(মণের আঁচ পেয়ে প্রস্তুতি নিতে শু(করে। **তৃতীয়তঃ,** খালসা বাহিনীর (মতা লাভ আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তারাই রাজদরবারের দৈনন্দিন প্রশাসনেও অনধিকার হস্ত(প করতে থাকে এবং সামরিক নেতারা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও স্বার্থপরতার নজীর রাখে। সামরিক বাহিনীর দৌরাত্মে প্রধান রাজকীয় কর্তাব্যক্তি(ও কর্মচারীদের জীবন দূর্দশাগ্রস্ত হয় এবং তারা যেন তেন প্রকারেণ খালসা বাহিনীর প্রতিপত্তি খর্ব করতে উদ্যত হয়। আর তাই রাণী ঝিন্দন কিছু শিখ কর্তা ব্যক্তি(র প্রভাবে খালসা বাহিনীকে ব্রিটিশদের বি(দ্ধে প্রেরণ করে।

ইংরেজ ও শিখদের লড়াই শু(হয় ১৮৪৫-এর ১৩ ডিসেম্বর। খালসা বাহিনী নায়কোচিত লড়াই করে। কিন্তু ইংরেজবাহিনী মুডকি, আলিওয়াল, ফিরোজশাহ প্রভৃতি সব লড়াইয়ে শিখদের পরাজিত করে। শিখরা এই অবস্থায় ব্রিটিশদের সঙ্গে লাহোরের সন্ধি (১৮৪২) সা(রে বাধ্য হয়। এর ফলে খালসা বাহিনীর আয়তন হ্রাস পায়, ব্রিটিশরা জলন্ধর, দোয়াব ও কা(্মীর লাভ করে ও যুদ্ধে (তিপূরণ বাবদ এক বিশাল অঙ্কের টাকা পায়। এই সময় থেকে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট লাহোরের রাজদরবারে নিযুক্ত(হয়। এরূপেই প্রথম ইঙ্গ-শিক যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

লাহোরের সন্ধি ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী (ুধা মেটাতে পারেনি এবং তারা পাঞ্জাবকে নিজেদের প্রত্য(শাসনে আনতে তৎপর হয়। অন্যদিকে স্বাধীনচেতা শিখরা লাহোরের সন্ধি মেনে নেয়নি। ফলে আর একটি সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। লাহোরের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট প্রায়ই দরবারের কার্যকলাপে অনধিকার হস্ত(প করতেন। এমনকী জন লরেন্স নামে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বহু প্রভাবশালী শিখ প্রধানদের অপদস্ত ও (মতাচ্যুত করে ছিলেন। তবে পাঞ্জাবে ব্রিটিশ বাহিনীর অবস্থিতিই শিখদের বেশী করে ভাবায়, আর ব্রিটিশরাও কখনোই বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়নি। রাণী ঝিন্দন শিখ রাজ্যাংশের এক্তি(য়ারে যে ব্রিটিশ বাহিনী বিদ্যমান ছিল তার বি(দ্ধে প্রতিবাদী হন এবং ব্রিটিশরা তাকে গ্রেপ্তার করে চুনারে প্রেরণ করে, এ সবের ফলে ১৮৪৮ খ্রীঃ শিখরা বিদ্রোহ করে এবং মূলরাজ ও চত্বর সিংহের নেতৃত্বে ধারাবাহিকভাবে মূলতান ও লাহোরের বি(োভের সৃষ্টি হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ লর্ড ডালহৌসী শিখদের বি(দ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও এভাবে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের সূচনা হয়। বিনিওয়ান ওয়ালার যুদ্ধে (১৮৪৯) ব্রিটিশরা শিখদের সমূলে

উৎপাটিত করে। এবং কিছুকাল পর ১৮৪৯ এর মার্চে ঘোষিত সরকারী নির্দেশনামার বলে ডালহৌসী পাঞ্জাবকে প্রত্য(ব্রিটিশ শাসনাধীনে আনেন। এই সময় খালসা বাহিনী ভেঙে দেওয়া হয় ও রাজা দিলীপ সিং ব্রিটিশের হাতে বন্দী হন। এভাবে ভারতের শেষ স্বাধীন রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত(হয়।

৩.৬ শিখদের পতনের কারণ

এই অনুসন্ধান করতে হবে রঞ্জিত সিংহের সময় থেকে। এই কথা সত্য যে তিনি শিখদের একটি জাতীয় রাজতন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু একথাও ঠিক যে, তিনি সামন্ততান্ত্রিকতার বিকাশে উৎসাহ দেন। যেহেতু শিখরাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল ছিল, তাই রঞ্জিত সিং বিশাল সংখ্যক সামরিক বাহিনীর র(ণাবে(ণের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করার সুযোগ পাননি। তাই তিনি বেতনের বদলে সেনাদের জাগীর দান করে থাকেন। আর এইভাবে ভূমিভিত্তিক সামরিক অভিজাতদের একটি শ্রেণী গড়ে ওঠে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিখ সামন্তরা পরবর্তীকালীন মুঘল অভিজাতদের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি ন্যূনতম বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত হন। **দ্বিতীয়তঃ,** রঞ্জিত সিংহের ন্যায় শক্তি(শালী শাসকের অধীনে শিখ সর্দাররা তাদের সাধারণ শত্রু ব্রিটিশদের দমনের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। কিন্তু রঞ্জিত সিংয়ের উত্তরাধিকারীরা ছিল দুর্বল। ফলে সমস্যা দেখা দেয় তখন। এই সময় সর্দারদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দরবারের রাজনীতির প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে। **তৃতীয়তঃ,** জাগীর ব্যবস্থা সামরিক বাহিনীর মজবুত ভিত্তিতে ফাটল ধরায় এবং এই বাহিনীর বিশৃঙ্খল চরিত্রে আরো প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে তা সরকারের সম্পদ নয়, বোঝা হয়ে ওঠে। **চতুর্থতঃ,** রঞ্জিত সিংহ খালসা বাহিনীকে নায়কোচিত সাহসিকতা ও মর্যাদার প্রতীকরূপে প্রতিপন্ন করেছিলেন। এই বাহিনী ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াইয়ে চূড়ান্ত দেশপ্রেমের পরিচয় দেয়। কিন্তু সামরিক অস্ত্রসজ্জার দিক থেকে ব্রিটিশদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। সর্বোপরি রঞ্জিত সিংহ ব্রিটিশ আগ্রাসনের ভবিষ্যত সম্ভাবনা প্রতিহত করতে পারেননি। অমৃতসরের সন্ধি স্বা(রের ফলে তিনি তার উত্তরাধিকারীদের স্কন্ধে এক গু(তর সমস্যার ভার অর্পন করেন। তিনি নিজ রাজ্যকে সাময়িকভাবে ব্রিটিশ আগ্রাসনের থেকে র(ার জন্য এই সন্ধিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন তবে এ ব্যাপারে তিনি যদি আর একটু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতেন ও দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিতেন তবে হয়ত পাঞ্জাবের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত।

৩.৭ ১৭৭৩ রেগুলেটিং আইন এবং পিটের ভারত আইন (১৭৮৪)

ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোঃ যখন ভারতে রাজ্যজয়ের প্রকল্পে নিয়োজিত হয় তখন ব্রিটিশদের এই নতুন সাম্রাজ্যে কীভাবে ইংরেজদের স্বার্থ সংর(ত হবে তা নিয়ে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা শু(হয়। সং(েপে বলতে গেলে কোম্পানী কর্তৃক রাজনৈতিক (মতা দখল কিন্তু অপ্রিয় প্র(ের জন্ম দেয় এবং ব্রিটেনে এক ব্যাপক প্রতিত্রি(য়ার সৃষ্টি হয়। একটি বেসরকারী কোম্পানী কোনো সাম্রাজ্যের নিয়ন্তা হবে তা ইংল্যান্ডের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মনঃপুত হয়নি। ১৮৩৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ পুণর্নবীকরণের সময় টমাস মেকলে ভারতীয় সাম্রাজ্যকে সকল প্রকার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার বিরল নিদর্শনরূপে দেখেছেন। **দ্বিতীয়তঃ,** ব্রিটিশরা ভারতে তাদের আধিপত্যকে বৈধতা ও যথার্থতা দান করতে চেয়েছিল, কেননা তাদের বিজেতা ভাবমূর্তি গণতন্ত্র ও যুক্তি(বাদের পরিপন্থী ছিল। **তৃতীয়তঃ,** ব্রিটিশ সরকারের প(কোম্পানীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করা অত্যন্ত জ(রী হয়ে পড়েছিল। বিশেষতঃ কোম্পানীর ভারতীয় রাজ্যাংশ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের যথেষ্ট চিন্তা ছিল। ফলে ভারতে কোম্পানীর উপর ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ

অপরিহার্য হয়ে ওঠে। **চতুর্থতঃ,** ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক (মতা দখল ইংল্যান্ডে এক বিরূপ প্রতিত্রি(য়া সৃষ্টি করে। কোম্পানীর যেসব কর্মচারীরা প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে ভারত থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতেন 'নবাব' রূপে পরিচিত হতেন, সেই সময় ব্রিটিশদের মনে এরূপ ভীতির উদ্রেক হয় যে এই নবাবরা তাদের অর্থবলে সংসদীয় রাজনীতিতে নাক গলাবে এবং ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। বিশেষতঃ, অবাধ বাণিজ্যের সমর্থকরা ভারতে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের বিরোধী ছিল। এই অবাধ বাণিজ্যকারীরা ভারতীয় ব্যবসা এবং ভারতীয় ধনসম্পদে ভাগ বসাতে চেয়েছিল, সে ব্যাপারে কোম্পানীর কর্মচারীরা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। এরূপ প্রে(াপটে রেগুলেটিং অ্যাক্ট ও পিটের ভারত আইন সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

১৭৭৩ খ্রীঃ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ হয়। এই আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সংসদ কোম্পানীর (মতা সীমিত করতে চায়। এই আইন অনুযায়ী কোম্পানীর ডাইরেক্টররা ভারতের বেসামরিক, সামরিক ও রাজস্বজনিত ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের নিকট হাজিরা দিতে বাধ্য হয়। পূর্বে গভর্নর জেনারেল ও চার সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ বাংলার শাসনভার যেভাবে পরিচালনা করত, বর্তমানে তা বাতিল করা হয়। এই সময় অন্য দুই প্রেসিডেন্সীর সরকারকেও বাংলা সরকারের অধীনস্থে পরিণত করা হয়। এর পাশাপাশি বম্বে বা মাদ্রাজের ব্রিটিশ কর্তৃপ(অন্য কোনো শক্তি(র সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন বা যুদ্ধ করার অধিকার হারায়। এই আইনানুযায়ী ইউরোপীয় ও তাদের কর্মচারীদের প্রতি ন্যায়বিচার পোষণের আশায় কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত স্থাপনের প্রস্তাবনা নেওয়া হয় ও ১৭৭৪ সালে কলিকাতায় প্রথম সুপ্রীমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রথম সর্ব্বোচ্চ বিচারপতি ছিলেন স্যার এলিজা ইম্পে। এই সময় থেকে বাংলার গভর্নর, গভর্নর জেনারেলরূপে পরিচিত হতে থাকেন এবং হেস্টিংস ছিলেন প্রথম গভর্নর জেনারেল। বস্তুত গভর্নর জেনারেল তাঁর কাউন্সিলের মাধ্যমে বাংলায় শাসনভার পরিচালনা করে থাকতেন, তার কাউন্সিলের যেকেনো সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্ণীত হত। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অমান্য করার কোনো (মতা গভর্নর জেনারেলের ছিল না। যদিও তিনি অনেক সময় নির্ণায়ক ভোট দিতে পারতেন।

কোম্পানীকে পরিচালনা করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এহেন পদ(পগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার কোম্পানীর উপর সেভাবে তার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেনি। এই আইনের কিছু ত্রুটী ছিল, যার ফলে সেই অনুযায়ী প্রশাসন পরিচালনায় সমস্যা দেখা যায়, এই আইনের অধীনে গভর্নর জেনারেলের প(স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভব ছিল না। তিনি পুরোপুরি কাউন্সিল-এর দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কাউন্সিল-এর তিন সদস্য একত্রিত হলে তারা গভর্নর জেনারেলের যেকোনো সিদ্ধান্ত (খে দিতে পারত। প্রকৃতপ(হেস্টিংসের সময়ে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে গভর্নর জেনারেল ও তার কাউন্সিলের মধ্যে মতানৈক্য হয়। ফলে শাসন পরিচালনা দুস্কর হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে মাদ্রাজ ও বম্বে প্রেসিডেন্সীকে বাংলার অধীনে আনার চেষ্টা হল, বাস্তবে বাংলার গভর্নর জেনারেল মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ওপর সেভাবে তার কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পারে নি। অনেক সময়ই প্রয়োজনের খাতিরে আলোচ্য প্রেসিডেন্সী দুটির শাসকরা বাংলায় গভর্নর জেনারেলের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করতেন।

তৃতীয়তঃ, রেগুলেটিং আইনের মাধ্যমে কোম্পানী ও তার ইংল্যান্ডস্থিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো যায় নি। কোম্পানীর সমালোচক গোষ্ঠীরা তখনো পর্যন্ত কোম্পানীর পরিকাঠামোয় শৃঙ্খলা বিধানের জন্য ব্রিটিশ সংসদের উপর চাপ দিতে থাক। সর্বোপরি রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হলে তার দ্বারা স্পষ্টভাবে এই আদালতের (মতার সীমা নির্দিষ্ট হয়নি, এমনকী গভর্নর জেনারেল (মতার কিরূপ বিস্তার ঘটাবেন তাও অনির্দিষ্ট

ছিল। যেহেতু সুপ্রীম কোর্টের এক্তি(য়ার নির্দিষ্ট রূপে ধার্য ছিল না, তাই সাংবিধানিক প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনাও যথেষ্ট ছিল। এই আইনের সীমাবদ্ধতাগুলি তার কার্যকারণের পরে পরেই প্রকট হয়ে ওঠে এবং একটি নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

রেগুলেটিং আইন জনিত বিবিধ সমস্যা এবং কোম্পানীর বিরোধী গোষ্ঠীগুলির চাপে পড়ে ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ সরকার ১৭৮৪ খ্রীঃ পিটের ভারত আইন প্রণয়ন করে। এই আইনটি ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিটের নামে পরিচিত হয়। এই আইনের দ্বারা ব্রিটিশ সরকার শেষ অব্দি ভারতীয় প্রশাসনের উপর তার আধিপত্য কায়েম করতে স(ম হয়। এই আইনানুযায়ী ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অফ কন্ট্রোল গঠিত হয়, যার হাতে তত্ত্বধানমূলক (মতা ছিল। বোর্ড অফ কন্ট্রোল, ভারতে কোর্ট অফ ডিরেক্টরস এবং কোম্পানী সরকারকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার (মতা ভোগ করত। এমনকী আপদ্‌কালীন সময়ে ডাইরেক্টরদের একটি গোপন কমিটির মাধ্যমে সরাসরি ভারতে নির্দেশ প্রেরণ করতে পারত। ফলে ভারতের উপর দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হল, যা কোর্ট অফ ডিরেক্টরস এবং বোর্ড অফ কন্ট্রোলের মাধ্যমে বলবৎ হয়ে থাকত। ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত এরূপ ব্যবস্থা চলেছিল এবং ঐ বছর ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতীয় উপনিবেশের দায়িত্ব নিয়েছিল। পিটের ভারত আইন প্রণীত হলে গভর্নর জেনারেলের (মতা পূর্বাপে(া বৃদ্ধি পায়, কেননা পূর্ববর্তী রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী তাঁর প(ছেদন করা হয়েছিল। পিটের ভারত আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেলের স্বাধীনতায় হস্ত(েপের অধিকার কাউন্সিল হারায়। এই সময় থেকে কোনো গু(ত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কাউন্সিলের একজন মাত্র সদস্যের সমর্থনই গভর্নর জেনারেলের কাম্য ছিল। এছাড়া যুদ্ধ, কূটনীতি ও রাজস্ব সংক্র(ান্ত সকল বিষয় বম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী বাংলা প্রেসিডেন্সীর অভিভাবকত্ব লাভ করে। পিটের ভারত আইনের তাৎপর্য হল এই যে এরপর থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বৃহত্তর ব্রিটিশ স্বার্থ পূরণের একটি মাধ্যমে পরিণত হয় এবং ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর অভিলাষ পূরণের জন্য ভারতের সহস্রাধিক জনগণকে বঞ্চিত করা হয়।

পিটের ভারত আইন অনুযায়ী প্রশাসন সম্পর্কে যে বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা ১৮৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। যদিও মাঝে মাঝে এ ব্যাপারে সামান্য কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। ১৭৮৬ সালে ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্র্নে গভর্নর জেনারেলকে কাউন্সিলের সদস্যদের সিদ্ধান্ত অমান্য করার অধিকার দেওয়া হয়। ১৭৯৩ তে সনদ আইননুযায়ী গভর্নর জেলারেলের (মতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং বম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীও মোটামুটি সমস্যাবিহীনভাবে কাজ চালাতে পারে। তবে ১৮৩৩-এর সনদ আইনানুযায়ী বম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর আইনী (মতা কেড়ে নেওয়া হয় এবং একমাত্র বাংলার গভর্নর জেনারেলই আইনী (মতা ভোগের চূড়ান্ত অধিকার পায়। ১৮৩৩ এর সনদ আইন বাংলার গভর্নর জেনারেলের নিকট খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, কারণ তিনি এখন থেকে বাংলার গভর্নর জেনারেলের পরিবর্তে ভারতের গভর্নর জেনারেলরূপে পরিচিত হন, যার হাতে যাবতীয় সরকারী (মতা কেন্দ্রীভূত হয়। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ছিলেন ১৮৩৩ এর সনদ আইনানুযায়ী ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল। গভর্নর জেনারেলের হাতে (মতা কেন্দ্রীভূত হলে একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়, বস্তুত এই সময় ভারতে একটি নতুন কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় প্রশাসনের বিকাশ ঘটে। ইংল্যান্ডের সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতের গভর্নর জেনারেল প্রকৃত শাসকে পরিণত হয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে ব্রিটিশ সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আইনী পদ(েপের মূলে ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর (মতা সঙ্কোচন এবং কোম্পানীকে বাধ্য করা হয় ব্রিটেনের বিবিধ বাণিজ্যিক ও শৈল্পিক স্বার্থের সমপূরক হতে। ১৮৩৩ থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের প্র্নে ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পূর্বের ছায়ায় পর্যবসিত হয়। সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার কখনোই প্রকৃত (মতা নিজের হাতে তুলে নেয়নি।

৩.৮ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি

ভারতে কোম্পানীর কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থ সংর(ণের জন্য ও অধিকৃত রাজ্যাংশের নিরাপত্তার দ(ণ যেরূপ চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে, তা ছিল তাদের আগ্রাসনাত্মক নীতি গ্রহণের পটভূমি। তারা যখনই প্রয়োজন পড়ত তখনই পাশব শক্তি(প্রয়োগ করে থাকত, আবার অনেক সময় অধীনতামূলক মিত্রতা বা স্বত্ব বিলোপের মাধ্যমে বিনারক্ত(পাতের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করত। আগ্রাসনাত্মক নীতির চেহারা যাই হোক না কেন তার ল(ণ প্রথম পরিস্ফুট হয়েছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে, তবে লর্ড ওয়েলেসলীর হাতেই তা চূড়ান্ত রূপ পায়। তিনি অতি দ্রুত সংখ্যাধিক ভারতীয় রাজ্যকে ব্রিটিশ ছত্রছায়া তলে আনতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় ইংল্যান্ডের সমাজ ও অর্থনীতির ত্র(মবর্ধমান চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে ভারতে ব্রিটিশ নীতির ভাঙা গড়া চলে।

এই সময় ব্রিটেনে শিল্পপতি শ্রেণীগুলির নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাদের উৎপাদিত পণ্যের আদর্শ বাজার হলে ভালো হত। সুতরাং ভারতের বাজার দখলের জন্য প্রয়োজন ছিল রাজ্য দখলের নীতি। **দ্বিতীয়তঃ,** ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গিয়েছিল ও সেই সূত্রে ভারতে ফরাসী আধিপত্য প্রসার ব্রিটিশরা প্রতিহত করতে উদ্যত হয়। ফরাসীরা যাতে এখানে কোনো সামরিক ঘাঁটি তৈরী করতে না পারে বা দেশীয় রাজ্যগুলি যাতে তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয় তাই ওয়েলেসলী অনেক ভেবেচিন্তেই সামরিক শক্তি(র প্রয়োগ ছেড়ে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি বেছে নেন। এই নীতির মাধ্যমে বিনা রক্ত(পাতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ হয়েছিল। এই নীতির মুখ্য শর্তগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ (১) একমাত্র অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণের মাধ্যমেই কোনো দেশীয় রাজ্য কোম্পানী সরকারের নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। (২) কোম্পানীর সেই মিত্ররাজাকে বাধ্যতামূলকভাবে তার সামরিক বাহিনী ভেঙে দিতে হবে। (৩) কোম্পানীর সশস্ত্র বাহিনী সেই মিত্র রাজ্যকে সামরিক সুর(া দেবে, (৪) নিজ রাজ্যের এক্তি(য়ারের মধ্যে কোম্পানীর বাহিনী মোতায়েনের দ(ণ মিত্র রাজাকে তার র(ণাবে(ণের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে। তবে বার্ষিকরূপে অর্থ প্রদান না করে তাঁর রাজ্যের কিছু অংশ ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর জন্য ছেড়ে দিলেও এই শর্ত পূরিত হবে। (৫) ইংরেজ কোম্পানীর অনুমোদন ব্যতীত মিত্ররাজা কোনো বিদেশী শক্তি(র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন না, বা তাঁর রাজ্যে কোনো বিদেশীকে কর্মচারী রূপে নিযুক্ত(করতে পারবেন না। (৬) অধীনতামূলক মিত্রতা অনুযায়ী মিত্ররাজা তার দরবার বা রাজসভায় একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মোতায়েনে বাধ্য থাকবেন। (৭) কোম্পানী এহেন প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল যে মিত্র রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যেকোনো ভাবে হস্ত(প করবে না, তবে এই প্রতিশ্রুতি সে কোনোদিনই পালন করেনি।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির পশ্চাতে ব্রিটিশদের যে উদ্দেশ্য নিহিত ছিল তার মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই নীতি যেসব দেশীয় রাজা গ্রহণ করে তাদের সার্বভৌমত্ব বলতে আর কিছুই ছিল না। তারা আত্মনিরাপত্তার পাশে পাশে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে নিজেদের বিবাদ মেটানোর অধিকারও হারিয়েছিল। সর্বোপরি ইংরেজ রেসিডেন্টের উপস্থিতির জন্য স্বাধীনভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাবার (মতাও তাদের ছিল না। ভারতীয় রাজাদের মধ্যে হায়দ্রাবাদের নিজামই সর্বপ্রথম এই নীতি গ্রহণ করেন। মারাঠা ও মহীশূরের অধিপতিরা এই নীতি গ্রহণে অসম্মত হন বলেই তাদের ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। অর্থনৈতিক ও সামরিক এই নীতি ব্রিটিশদের প(খুবই লাভজনক বিবেচিত হয়।

৩.৯ লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক গৃহীত রাজ্যবিস্তার নীতি (১৮৪৮-'৫৬)

১৮৪৮ খ্রীঃ লর্ড ডালহৌসী গভর্নর জেনারেল রূপে ভারতে পদার্পন করেন। তিনি অতি উৎসাহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন, যার পরিণতিতে অল্প সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ— ভারতীয় সাম্রাজ্য সর্বচ্চোরূপে বিস্তার লাভ করে। ১৮ শতকের শেষার্ধে ও ১৯ শতকে দেশীয় রাজাদের প্রসঙ্গে ব্রিটিশ শাসকরা খুবই নির্দয় মনোভাব পোষণ করতেন। এঁদের মধ্যে সেই রাজারা ছিলেন অরাজকতা ও ক(নাহীনতার প্রতীক। ডালহৌসীও দেশীয় রাজাদের সম্পর্কে আলোচ্য বিষয়ে ব্যতিত্র(ম ছিলেন না এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার থেকে ভারতকে র(া করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তার এরূপ আপাত উদারনৈতিক চিন্তাধারার পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদের অন্তহীন লালসা লুকিয়েছিল। এই সময় ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ-ব তার তুঙ্গে পৌঁছেছিল। ও ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা তাদের ফ্যাক্টরীতে উৎপন্ন দ্রব্য বিত্র(ীর জন্য ভারতের বাজার প্রশস্ত করতে চেয়েছিল। দেশীয় রাজ্য গ্রাসের মাধ্যমে ডালহৌসী এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করেছিলেন।

ডালহৌসী ছিলেন স্বতঃবিলোপ নীতির জনক। এই নীতির পরিণতিতে দেশীয় রাজারা পু(ষ সন্তান দত্তক নেবার অধিকার হারান। এই নীতির মাধ্যমে একথা বলা হয়েছে যদি কোনো রাজা পুত্রসন্তান না থাকে তবে তাঁর রাজ্য ব্রিটিশরা অধিগ্রহণ করবে। পূর্বে অপুত্রক রাজারা তাদের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের অধিকার পেতেন এবং পুত্র সন্তান দত্তক নেবার প্রথা খুবই প্রাচীন ছিল। এমনকী হিন্দু ধর্মেও পুত্র দত্তক নেবার কথা বলা আছে। এবং ধর্মানুযায়ী সেই দত্তক পুত্র পিতার মৃত্যুর পর তার পারলৌকিক কাজ করতে পারবে। এদিক থেকে, স্বত্ববিলোপ নীতি ছিল দেশীয় রাজার ঐতিহ্যিক অধিকার খর্ব করার প্রয়াস। এমনকী পূর্বে ব্রিটিশরা যেসব রাজাকে দত্তক নেবার অনুমতি দিয়েছিল বর্তমানে সেই দত্তক পুত্রের অধিকারও বাতিল করা হল। স্বত্ববিলোপ নীতি কোম্পানীর লাভের কড়ি পূর্ণ করেছিল ও তারা এরূপে সাতারা, নাগপুর ও ঝাঁসির রাজ্য গ্রাস করেছিল।

স্বত্ববিলোপনীতি ছাড়াও ডালহৌসীর পূর্ববর্তী গভর্নর জেনারেলদের অনুসৃত সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি অবলম্বন করেন। এরই পরিণতিতে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের পর, ১৮৪৯ খ্রীঃ ব্রিটিশরা পুরোপুরি পাঞ্জাব দখলে সমর্থ হয়। ১৮৫২ তে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে ব্রিটিশদের জয়লাভের ফলে সাম্রাজ্যের পূর্বসীমানা সালউইন নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। উত্তরে সিকিম ডালহৌসির হস্তগত হয়। এবং তিনি নিজামের থেকে বেরার দখল করেন। বলা যায় এরূপে ডালহৌসির আমলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সর্বচ্চো সীমান্তে পৌঁছায়।

কুশাসন ও অরাজকতার অজুহাতে ডালহৌসী অনেক দেশীয় রাজার রাজ্য কেড়ে নেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলীর কথা বলতে পারি, যাকে এই অভিযোগে ১৮৫৬ খ্রীঃ সিংহাসনচ্যুত করা হয়। একথা বলা বোধহয় অযৌত্তি(ক নয় যে বিভিন্ন দেশীয় রাজার রাজদরবারে বিবাদমান গোষ্ঠীগুলিকে একে অপরের বি(দ্ধে কাজে লাগিয়ে ইংরেজরাই রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল।

দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি তথাকথিত জনহিতৈষণা থেকে ডালহৌসী যে ভারতে ব্রিটিশ বাজার প্রসারে সচেষ্ট হয়েছিলেন এরূপ প্রতীয়মান হয়েছিল। বস্তুত জনহিতৈষণা দূরে থাক, বরং ভারতকে ব্রিটিশ দ্রব্যের বাজার ও ব্রিটেনে সরবরাহকৃত কাঁচামালের উৎসরূপেই শাসকরা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বলা যায় প্রজাকল্যাণের নামে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন দেশীয় রাজ্যের প্রতি ব্রিটিশদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছিল। তবে উপরমহলে এমন কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেনি যা ভারতীয় জনতার উপর চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলবে। বরং ব্রিটিশদের অবলম্বিত নীতি ভারতীয় রাজা, মহারাজা ও তাদের পরিবারের উপর বিধ্বংসী ঘূর্ণবাতের মত আছড়ে পড়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

T. R. Metcalfe — Ideologies of the Raj.
Sekhar Bandyopadhyay — From Plassey to Partition.
Sumit Sarkar — Modern India.
Peter Robb — A History of India.
Bipan Chandra — India is struggle for Independence.

৩.১১ অনুশীলনী

১. ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের কারণ ও পরিণাম সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২. হায়দর আলীর কৃতিত্ব নিয়ে অলোচনা কর।
৩. ইংরেজদের সঙ্গে টিপু সুলতানের সম্পর্ক আলোচনা কর। এবং মহীশূরের পতনের কারণ উল্লেখ কর।
৪. ইংরেজ ও মারাঠাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা কর।
৫. শিখ জাতির অভ্যুত্থানের পিছনে রণজিৎ সিংহের ভূমিকা আলোচনা কর।
৬. শিখদের পতনের কারণ সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৭. 'Doctrine of Lapse' ডক্ট্রিন অফ্ ল্যাপ্স' বলতে কি বোঝ? এই নীতি প্রবর্তনের ফলাফল আলোচনা কর।
৮. 'Subsidiary Alliance' 'সাবসিডিয়ারী এ্যালায়ান্স' প্রবর্তনের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ কতটা সম্ভব হয়েছিল।
৯. মারাঠা শক্তির পতনের কারণ আলোচনা কর।